তৃতীয় বর্ষ একাদশ সংখ্যা
আশ্বিন - ১৩৮২ সেপ্টেম্বর ৭৫

ইন্‌কারাজের গুপ্তধন

পূর্বানুবৃত্তি

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

Approved by the Directorate of Public Instructions, West Bengal as a Children's Monthly Magazine. Vide No. 154 (16) T. B. C. *Dated 5. 4. '75.*

খুকীর ঝোঁক (কবিতা)
কালিদাস রায় ৪৭১

আশ্বিনে (কবিতা)
সতীরঞ্জন আদক ৪৭২

স্মৃতি (কবিতা)
মধুশ্রী মৈত্র ৪৭৩

চেনা-শোনার পালা (হাসির গল্প)
শিবরাম চক্রবর্তী ৪৭৩

মজার মানুষ লুইস ক্যারোল (কাহিনী)
উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৪৭৯

ইচ্ছে (ছড়া)
বারীন বসু ৪৮১

কেশবতী কন্যা (রূপকথা)
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর ৪৮২

নির্বাক যাত্রী (ভৌতিক গল্প)
শ্রীবিমল দত্ত ৪৮৬

ছড়া
সলিল মিত্র ৪৮৯

বুমেরাং (গল্প)
বেলা দেবী ৪৯০

চির শরৎ (কবিতা)
গোপাল ভট্টাচার্য ৪৯৪

ট্রামগাড়ীর গল্প
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচা ৪৯৫

নসীপুরের নিশি (ধার াহিক চিত্রকাহিনী)
প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪৯৮

ঐন্দ্রজালিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)
হেমেন্দ্রকুমার রায় ৫০১

রাণী না দেবী (কাহিনী)
গৌরী সাহারায় ৫০৬

এক দামাল ছেলের গল্প
রণজিৎ চক্রবর্তী ৫০৭

শরৎ সকালে (কবিতা)
শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার ৫১১

বিভীষিকার রাজ্যে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)
পার্থসারথি ৫১২

ধাঁধা, ধাঁধার মতোই ধাঁধা নয় ৫১৬

সম্পাদক : শ্রীরবিদাস সাহারায়

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার কর্তৃক বি-৪ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রাঙ্কন ৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

তৃতীয় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৮২ : সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫
দাম : এক টাকা

পেটের পীড়ায় অব্যর্থ!
ডাঃ সেনের ষ্টমাক কিওর
DR. SEN'S STOMACH CURE
STOMACH CURE
পিত্তশূল, অম্লশূল, অম্লবিকার, ডিস্‌পেপসিয়া, অজীর্ণ প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি অথবা পাকস্থলীর যে কোন মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে দ্রুত নিষ্কৃতি পাবেন।
ফোন: ৫৫-৩১৬০
সেনস্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ (প্রাঃ) লিঃ
২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা ৬

৩য় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : আশ্বিন, ১৩৮২ : সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

খুকীর ঝোঁক

কবিশেখর কালিদাস রায়, দেশিকোত্তম, ডি-লিট

দিনে দিনে হ'ল বড় ঝুঁকী
তাইত আজকে প্রাতে চড় খেয়ে মার হাতে
চুপ করে বসেছিল খুকী।
মেরে তারে মা-র মন অনুতাপে সারাক্ষণ
জ্বলে যায় চোখে আসে জল।
খুকী আজ অভিমানে কিছুই শোনে না কানে
সোহাগে হয় না কিছু ফল॥
মনে পড়ে গেল মার বলেছিল একবার
অমৃতী জিলিপি ভালবাসি।
বিকালে তা কিনে এনে খাওয়ায় সে কোলে টেনে,
ফুটাল খুকীর মুখে হাসি।
পিতা এসে বলে, একি! আজকে হঠাৎ দেখি
খুকী তোর বড় যে আদর!
খুকী হেসে বলে, বাবা, তুমিও অমৃতী পাবা
মা-র হাতে, খাও যদি চড়।

———

আশ্বিনে

সতীরঞ্জন আদক

আশ্বিনে সোনা রঙ্ ধূ ধূ কাশবন
চুপি চুপি ডেকে বলে : এসো গো এখন
এলে তুমি খুঁজে পাবে শালিকের মন।

শাখে শাখে ফুল আর দোয়েলের শিস্
ঝাউ বনে হাওয়া এসে করে ফিস্ ফিস্
ঢেউ জাগা ধানে নামে উমার আশিস।

দোরে দোরে আল্পনা শিশুদের গান
তির্তিরে রূপো-নদী ভরে দেয় প্রাণ
ঘুম ভাঙা রোদ্দুরে শরতের ঘ্রাণ।

যদি ও এখন ভরা মাঠ খাল বিল
তবু তুমি খুঁজে পাবে কোথায় সে মিল
আশ্বিনে আলো ছায়ে আকাশের নীল।

স্মৃতি

মধুশ্রী মৈত্র

রাত্রি এখন নিকষ কালো
অন্ধকারে ঢাকে।
নিজেকে মোর লাগে বড়োই একা,
অনেক দূরে দৃষ্টি মেলে
দেখি আকাশটাকে,
হারিয়ে যাওয়া অতীত স্মৃতি
নতুন করে ডাকে।
দিনের আলোয় রয় সে ঢাকা
কেবল শুধু কাজে
রাতের কালো অন্ধকারে
দাঁড়ায় আমার মাঝে,
অতীত আসি বর্তমানের
দাঁড়ায় মুখোমুখি
অবাক চোখে তাকিয়ে দেখি
নিদ্রাহারা রাতের সাথী
এসেছে মোর একি ?

শিবরাম চক্রবর্তী

আমার ধারণা ছিলো যে, সকলের মত আমিও একটি অদ্বিতীয়। একমেব দ্বিতীয়ম। এই পেটেণ্ট আমার আর জোড়া নেই। এমনটি আর হয় না। কিন্তু এই বিশ্বাস সেদিন আমার টলে গেছে

আমার দ্বিতীয় সংস্করণ রয়েছে। এই সেদিন আমি তার দেখা পেয়েছি। সত্যি বললে, আমি দেখিনি ঠিক তবে আরেকজন তার দেখতে পেয়েছে। আর তার চোখেই আমার দেখা।

গোলদিঘির মোড়েই দেখলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেটাতেই। কনভোকেশনের জন্যে, না কী হেতু কে জানে, সেদিন বেশ ভিড় জমেছিল সেখানে, জনতার বেড়ায় আমি আটকা পড়েছি, নড়তে পারছিনে এক পা, এমন সময়ে তাকে দেখা গেল…

লোকটা অপলক নেত্রে আমার দিকে তাকিয়েছিলো। তার তাক্ ছিলো আমার কাছে আসবার। কিন্তু তার আর আমার মধ্যে বেশ কয়েক প্রস্থ লোক। সেই জন্যেই (আর এজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ!) লোকটা তীরবেগে আমার তীরে এসে পৌঁছতে পারছিলো না। তার দু'চোখে কী লোলুপ দৃষ্টি আর মুখময় কেমন এক জিঘাংসা, নাগাল পেলেই যেন আমায় গালে ফেলবে—গিলে ফেলবে টক্ করে! কিন্তু হায় এত অদূরে থেকেও, সে সুদূরপরাহত হয়েছিলো।

আমাকে দেখিয়ে তার পার্শ্বচরকে বলছিলো। সে (স্পষ্টই আমি শুনলাম) ছাখ্ ছাখ্, ঐ লোকটাকে চিনে রাখ্ ভাল করে। সেদিন আমাদের দোকানে দু'টাকার সন্দেশ মেরে দাম না দিয়ে সরে পড়েছে। আজ ব্যাটার দেখা পেয়েছি, তকে থাক্ পাকড়াতে হবে আজ ওকে—তারপর টাকা দেয় ভালোই নইলে রামগাট্টায় ওর ভূত ভাগাবো! বুঝিয়ে দেব বাছাধনকে—বিনে পয়সায় রাজভোগ খাওয়ার মজা কেমন!

শুনেই তো আক্কেল গুড়ুম আমার! ওরা যে কোন্ দোকানের কিছুতেই ঠাওর করতে পারলুম না। মেঠাই তো কম ঠাঁই খাইনি, তবে এ-কথাও ঠিক যে বিনে পয়সায় সন্দেশ খাবার বান্দা আমি নই। তার মানে এ নয় যে ধারে কোনো খাবার পেলে তা আমার গলা দিয়ে যাবার নয়। তবে কিনা, আসলে তেমন কিছু আমার ধারে-কাছে আসার নয়। কেনো সন্দেশগুলাই আমাকে ধার দেবার পাত্র নয়। তারা আগে আমার কাছ থেকে দাম নেয়। তারপরে আমায় দেয়। তা রাজভোগই কি, আর দরবেশই বা কি। কিন্তু দরবেশের দর বেশি, না, রাজভোগের আদর বেশি এ নিয়ে সরেস গবেষণা করার সময় তখন নয়। লোক দুটো যে ভাবে এগিয়ে আসার জন্য আঁকু-পাঁকু করছিলো, চারটে চোখ কট্‌মট করে পাকিয়ে—তাতে···আর সে চোখের দৃষ্টি, সত্যি বলতে, মোটেই 'আবার খাবো'র মতন নয়। বরং অনেকটা এই রকমের এবার খাবো—হাতে পেলেই! দাঁড়াও না, কড়মড় করে চিবিয়ে খাচ্ছি। দেখে আর আমি দাঁড়ালাম না, ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে গেলাম। জনতাই আমাকে সেই দুর্জনতার হাত থেকে বাঁচালো। আরো গভীরে ঢুকে আমি হারিয়ে গেলাম, দেখতে না দেখতেই। তারপর ভিড়ের আরেক মুখ দিয়ে বেরিয়ে, সামনে ট্রাম পেয়ে লাফিয়ে উঠে আমার হাঁফ ছাড়লাম। হাঁ হাপ ছেড়ে বাঁচলাম তারপর।

তখন আমার মনে পড়লো যে মুকুন্দ। মুকুন্দ ছাড়া আর কেউ নয়। এই লোকটা মুকুন্দ না হয়ে যায় না।

মুকুন্দর সঙ্গেও মোলাকাৎ আমার ঠিক এমনি করেই। বছর দশেক আগে, কলেজে পড়ি তখন।

মুকুন্দকে যে আমি জানতাম তা নয়। এখনো জানিনে। সে যে কে, কোথাকার, কেন যে, কী উদ্দেশ্যে যে আমার জীবন পথে এসে ভিড়েছিলো, এখনো আমি তা মালুম করতে পারিনি।

সেও এসেছিল প্রায় এই ভাবেই।

যেড়াচ্ছিলাম হাজরা পার্কে, এমন সময়ে সে হাজির। সেই মুকুন্দ···একেবারে হঠাৎ!

তখনি তার সঙ্গে আমার চেনাশোনা হলো সেই প্রথম।

সেও সেবারেও সেই অপরের মধ্যস্থতায়। এই রকম প্রায়।

সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি ? মুকুন্দ ?

আমি তো অবাক্! কী বলবো ভেবে পাইনে। হক্‌চকিয়ে মিনিট খানেক বুঝি চুপ করে থাকি।

মৌনতা হচ্ছে এক ধরনের স্বীকারোক্তি। আমাকে মূক দেখে, ভদ্রলোক হয়তো তার মুকুন্দকে ছাখেন। তখন তার নিজের স্বরূপ আরো একটু মুক্ত করেন—'ভালোই হলো তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে। নিকুঞ্জকে বোলো যে—'

মুকুন্দকে বুঝবার চেষ্টা করছি এমন সময় এই নিকুঞ্জের প্রবেশের পর, সমস্তই যেন গুলিয়ে গেল। নিকুঞ্জ কাননে প্রবেশ করে তুজনেই আমরা পথের খেই হারালাম। জানা গেল সে এই নিকুঞ্জের কাছ থেকে উনি কিছু টাকা পান, কিন্তু সে হতভাগা তা না দিয়েই নাকি গা ঢাকা দিয়েছে। নাকি ঢাকায় চলে গেছে। টাকা আর নিকুঞ্জ তুই-ই গায়েব। তা আমি যদি আমার মামার কাছ থেকে টাকাটা এনে তাঁকে দিই—

'কিন্তু আমি তো নিকুঞ্জ নই।' আমি কানাই।

'আহা তুমি কেন নিকুঞ্জ হবে। তুমি তো মুকুন্দ। নিকুঞ্জ তোমার মামাত ভাই—তুমি হচ্ছো তার পিসতুত—

আজ্ঞে না আমি মুকুন্দও নই। আপনি ভুল করছেন।'

এতটা এগুবার পর মুকুন্দকে না পেয়ে ভদ্রলোক বুঝি মর্মাহত হলেন। হয়তো একটু লজ্জিতও। নিকুঞ্জ তো বেহাত হয়েছিলই, এখন মুকুন্দকেও হাতছাড়া হতে দেখে, বোধহয় একটু চটেমটেই আমার প্রতি একেবারে বিরূপ হয় তিনি উল্‌টো পথ ধরলেন। সত্যি মানুষকে চেনা যেমন সোজা, তেমনি আবার বেশী শক্তও। সেই মুকুন্দই, দেখা যাচ্ছে এখন আমার সঙ্গে পরিচয়ের অপেক্ষা না রেখেই, আমার ছদ্মবেশেই সন্দেশ খেয়ে পিটটান মেরেছে। বিলকুল তার মামাত ভাই নিকুঞ্জর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই। এদিকে আমি কারো টাকা তো হজম করতে পারিই নি সন্দেশও না, মারমুখো লোকদের সম্মুখে এখন

মার খাবার মুখে দাঁড়িয়ে! আরে এ-কে? সামনের সীটে আমার মুখোমুখি বসেছেন চেনা চেনা এই লোকটা? আমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়তো না—বছর দশ বারো আগে? মুখ দেখেই চিনতে পেয়েছি, কিন্তু আমার স্কুল-ফ্রেণ্ডের মধ্যে ঠিক কোনটি যে ও, তা ঠাওর করতে পারছিনে কিছুতেই। নামটাই মনে আসছে না আদপে। কিন্তু আমার দিকে তার দৃষ্টি ছিল না। এক মনে সে ইলাস্ট্রেটেড উইকলি পড়ছিল।

জিজ্ঞেস করবো নাকি এগিয়ে? কিন্তু এও তো হতে পারে আদৌ ও আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিল না, ছিল এক ক্লাস-ফো—এক নম্বরের এনিমি ক্লাসেরই বলা যায় যাকে।

এই হয়তো সেই ছেলেটা, পুকুরে নাইবার সময় সে আমায় একবার চুবিয়ে ধরেছিল—প্রায় ডুবিয়ে মেরেছিল। আরেকটু হলে! কিম্বা তার চেয়েও আরো খারাপ, হয়তো সেও হতে পারে, যাকে আমিই চুবোন দিয়েছিলাম একবার—কৌতুক-চ্ছলেই বলতে গেলে! কিন্তু ছোড়াটা আবার রসিকতা বুঝতে না পেরে সটান হেড মাষ্টারের কাছে গিয়ে লাগিয়ে দিয়ে মার খাইয়ে ছিলো আমার···

আচ্ছা একি তাহলে সেই হবে কেলাসে বসে যে কান নাচাতো? ঠোঁট দুমড়ে সিস্ দিতে পারতো অদ্ভুত? না, সে তো হরিহর, আমার মনে আছে খুব। বড় হয়ে এতদিনে সে তার পৈতৃক মুদির দোকানের মালিক হয়েছে। এখন তার সাপ্তাহিক বসুমতী কিম্বা অর্ধসাপ্তাহিক আনন্দবাজার পড়ার কথা, এই ইলাস্ট্রেটেড উইকলি নয়।

তাহলে কে ও? ধরা একটু মুশকিলই, এমন কি—পাঁজাকোলা করেও আর ধরা যায় না। ইস্কুলের সেই ছিপছিপে চেহারা তো নেই, শরীরটা বেশ বাগিয়েছে এর মধ্যেই। এই ক'বছরেই মুটিয়েছে, ভারি। ভুঁড়ি হয়েছে তার ওপর, কেবল ভুঁড়ির জায়গাতেই না, গালে মুখেও। গলদেশে, বগলের পাশে, চিবুকের তলায়। চর্বিতে চির্বিতে ভরতি। হাতে পারে, সারা গায় সবখানেই ভুরি ভুরি। এমন চর্বিত দেহ পেলে যে-কোনো খাসী গর্বিত হতে পারে। যে-কোনো বাঘ খুশী হতে পারে চর্বিত চর্বণের সুযোগে!

ট্রামটা টার্মিনাসে এসে থেমে গেল অবশেষে। কাগজখানা মুড়ে উঠে দাঁড়ালো ও। তখন ওর চোখ পড়লো আমার ওপর।—'আরে কে ও! আমাদের···না?' 'ব'লে এমন একটা নাম ধরে সে আমায় ডাকলো, যে-নামটা নাকি আমি গালে প্রথম ক্ষুর বোলাবার সঙ্গে সঙ্গেই চেঁছে ফেলেছি। ভুলে গেছি দুঃস্বপ্নের মতই। আমার সেই

ডাকনাম এখন আমি উচ্চারণ করতে তো বটেই, উচ্চারিত হতে দিতেও নারাজ। সে নাম ডাক - সর্বজন সমক্ষে হাজির করার নয়।

'অ্যাদ্দিন পরে এখানে এভাবে আমাদের দেখা হবে তা ভাবতেও পারা যায় না। যাক্ তুই এখন করছিস্ কী? যাচ্ছিস্ কোথায়? হাতে তোর কোনো কাজ আছে নাকি এখনই?'

'এমন কিছু না। এমনিই বেড়াতে বেড়িয়েছি।'

'তাহলে চ' আমার সঙ্গে। আমি এক বিখ্যাত লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। অধ্যাপক অমিয়নাথের নাম শুনেছিস্? বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক—তাঁর সঙ্গেই।'

'তিনি ডেকেছেন বুঝি তোমায়?' অবাক হয়ে আমি শুধাই। 'না না। তিনি কেন ডাকবেন? তিনি আমায় চেনেনও না। আলাপ করতে যাচ্ছি আমি তাঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে। বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে চেনা-শোনা হওয়াটা ভালো। তাঁর অটোগ্রাফও নেব কিনা আবার।'

'নেবে যে, তা ক্যামেরা কই তোমার সঙ্গে?' আমি তো আরো অবাক্!

'ফটোগ্রাফ নয় রে অটোগ্রাফ। ভদ্রলোকের হাতের লেখা আর নামসই। অটোগ্রাফ কাকে বলে জানিসনে? অধ্যাপক নামেও যেমন অমিয় তেমনি ভারি অমায়িক লোক ভাই। কেউ তাঁর বাড়ি গেলে এমন নাকি খাওয়ান যে···। ধরে বেঁধে খাইয়ে দেন বলে শুনেছি।'

শুনে আমি একটু খুশী হলাম—'তাহলে আর যেতে বাকি কি? যাওয়া যাক। খাওয়াও যাবে।'

উৎসাহিত হয়ে ওর সঙ্গ ধরলাম তখন।

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক তখন পেল্লায় এক কুকুরের সঙ্গে হাওয়া খাচ্ছিলেন নিজের বাগানে। কুকুরের গলার চেনটা ছিলো তাঁর হাতে। সঠিক বললে কুকুরটাই যেন তাঁকে চেনে বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। হাওয়া খাওয়াচ্ছিল তাঁকেই। হাওয়া খেতে খেতে তিনি গলদঘর্ম হচ্ছিলেন। গেট পেরিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। যেতেই অমিয়নাথ চোখ তুললেন। তার সবিস্ময় সপ্রশ্ন দৃষ্টি ন্যস্ত করলেন আমাদের ওপর—আমার সঙ্গীটি (তখনো আমি তার নামের আঁচ পাইনি, তাঁর নাম ডাক্তার অমিয়নাথ পাকড়াশী) তাতে তোমার কিহে ছোকরা?' অমিয়বাবু ফোঁস করে উঠলেন।

'আমরা আলাপ করতে এসেছি। আপনার দর্শন পেলাম, আজ আমাদের কী ভাগ্য!'

'আলাপ করতে এসেছ? বটে! তাহলে আগে এর সঙ্গে আলাপ করো—' এই বলে সেই মারাত্মক কুকুরটাকে তিনি আমার বন্ধুটির সামনে খাড়া করলেন—'এও ভারি সদালাপী—তোমার মতই। অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ করতে এত ভালোবাসে···'

কুকুরটা তো লাফাতে লাগলো—আমাদের গায় পড়ে আলাপ করবার জন্য। তিন পা আমি পিছিয়ে এলাম।

—'এই! দেখছিস্ কি? চলে আয় পালিয়ে আয়! দাঁত দেখেছিস কুকুরটার?'

না, বাবা, খুব হয়েছে, আর না। আর আলাপে কাজ নেই। 'অমিয় গরল ভেল' পড়েছিলাম যেন কোথায়, কিন্তু কথাটা বেধড়ক খাঁটি, একটুও ভেল নেই' ওর ভেতর। কিন্তু আমার মনে হোলো কুকুরটা ওর চেয়েও বেশি গাড়োল। ডাক্তার পাকড়াশীর থেকে বরং ছাড়ান্ আছে কিন্তু ও পাকড়ালে আর রক্ষে নেই।

ভদ্রলোক কুকুরের চেনটা খুলবার ফাঁকে আমার দিকে তাকালেন একবার···

'আহা তোমাকে যে আমি চিনি হে!' বলে তিনি এগিয়ে এলেন আমার দিকে —'তুমি তো আমার চেনাই বটে! তুমি হচ্ছো···

আমি তখন এক পা এক পা করে পিছোচ্চি। চিহ্নিত হবার আগেই সেখান থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হবার জন্যে। চেনাশোনার পালা থেকে পালাতে পারলে বাঁচি তখন। 'তোমাকে আমি চিনি। ভালো করেই চিনি তোমায়। তুমি হচ্ছো···না না ···নিকুঞ্জের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি মুকুন্দ নও। তাই না?'

'খুব বেঁচে গেছি বাবা!' বাইরে এসে আমার সহচরটি দম নিয়ে বলে: 'আরে এযে আমাদের অমুদা! যাক, বড্ড বাঁচিয়েছিস্···।'

অমুদা? সে আবার কে?'

'আমি যে নিকুঞ্জ, তুই বলে দিসনি ভাগ্যিস্।'

———

মজার মানুষ লুইস ক্যারোল

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

তোমরা নিশ্চয়ই লুইস ক্যারোলের লেখা "আজব দেশে এলিস" গল্পটা সবাই পড়েছো, ছোটদের জন্যে আজ পর্যন্ত যত মজাদার রূপকথা লেখা হয়েছে এই কাহিনীটা মনে হয় তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। কিন্তু লুইস ক্যারোল নামটা কানে শুনতে যতই মিষ্টি লাগুক, এটা লেখকের আসল নাম নয়; আসল নামটা বেশ খট্‌মটে—রেভারেণ্ড চার্লস লুডভিগ ডজসন! এই ডজসন সাহেব আদতে ছিলেন একজন ধর্মযাজক; ওদেশের পাদরীদের বলা হয় রেভারেণ্ড! তাঁর প্রকৃত নাম চার্লস আর পদবী ডজসন। এই ডজসন সাহেব পাদরী হিসাবে জীবন শুরু করলেও অঙ্কে ছিল তাঁর খুব মাথা। তিনি ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক। অঙ্ক জানা লোক হিসাবে সবাই খুব খাতির করতো তাঁকে। মানুষটির নেশাই ছিল জটিল অঙ্কের সমাধান খুঁজে বার করা। চলতে ফিরতে সব সময় মাথার মধ্যে গিজ গিজ করতো অঙ্কশাস্ত্রের নানা জটিল সমস্যা!

কিন্তু শুধু অঙ্কে নয়, ছোটদেরও খুব ভালবাসতেন তিনি, তাঁর নিজের ঘর সংসার বলতে ছিল না কিছুই। তবু শহর শুদ্ধ সব বাচ্ছা-কাচ্ছাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল পাদরী সাহেবের এক মজার সংসার। ছুটির দিনে ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় করতো নিঃসঙ্গ ডজসনের বাড়িতে। তিনি নিজেও সেই মুহূর্তে যেন শিশু হয়ে যেতেন। তাদের জন্যে ছড়া বানাতেন, ছবি আঁকতেন, ধাঁধা আওড়াতেন; নতুন নতুন খেলায় মেতে উঠতেন তাদের নিয়ে। রাস্তা দিয়ে লোকেরা যেতে যেতে ভাবতো গুরুগম্ভীর অঙ্কের অধ্যাপকের আজ হল কি!

একবার ১৮৬২ সালে ডজসন সাহেব তাঁর বন্ধু ডীন লীডেলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে গেলেন টেমসের ধারে; তোমরা নিশ্চয়ই জানো টেমস হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত নদী। সেই নদীর বুকে নৌকা করে বেড়াতে বেড়াতে লিডেলের বড়ো মেয়ে ফুট্‌ফুটে এলিস হঠাৎ একটা গল্প বলার জন্যে ধরে বসলো পাদরী সাহেবকে।

ডজসন বললেন—'বেশ তো ঘাটে নামি তারপর চা বিস্কুট খেতে খেতে তোমাদের সবাইকে শুনিয়ে দেবো এক মজার গল্প!'

অঙ্কের মাস্টার হলে কি হবে ডজসন সাহেবের মনটা ছিল ঠিক শিশুর মত কল্পনা-প্রবণ আর কৌতূহলী; তাই গল্প বানাতে তাঁর খুব একটা সময় লাগলো না! পিকনিকের খাবার গোছাতে গোছাতে ডজসন মুখে মুখে বানিয়ে ফেললেন এক আষাঢ়ে কাহিনী। আর সেই কাহিনীর নায়িকা স্বয়ং এলিস। একটা ছোট্ট খরগোসের পেছনে ধাওয়া করে করে যেন এলিস পড়ে গিয়েছিল এক গর্তের মধ্যে; আর সেই গর্তের মধ্যে ঢুকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল তার নানা অ্যাডভেঞ্চার। তাই নিয়ে শুরু হল এক আজগুবি গল্প; এই গল্পের প্রতি লাইনে যত চমক তত মজা। আর চরিত্রগুলিও সব প্রায় চেনা-চেনা, কোনটা এসেছে ছড়া থেকে আর কোনটা রূপকথার রাজ্য থেকে। বেচারা এলিস, ঐ গর্তে ঢুকে তার কিনা বিপত্তি। হেনস্তার একশেষ! গল্প শুনতে শুনতে যাবার কথাও ভুলে গেল লিডেলের ছেলেমেয়েরা। কখন যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে সে খেয়ালও রইলো না কারও।

অবশেষে বাপ-মা খুঁজতে আসায় গল্পের ছেদ পড়লো। তখন এলিস তার ছবি আঁকার খাতায় এই গল্পটা লিখে দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো ডজসনকে। তাই পাদরী সাহেব সেই রাতেই বসে গেলেন এলিসের খাতা নিয়ে। লিখে ফেললেন আজব দেশে এলিসের অ্যাড্‌ভেঞ্চার। লিডেল পরিবারের বৈঠকখানায় বেশ কিছুদিন পড়ে রইলো ডজসনের খাতাখানা। অনেকেই ঐ মজার গল্পটা ছাপিয়ে বার করবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো তাঁকে। কিন্তু লাজুক প্রকৃতির পাদরী সাহেব নানা অজুহাতে এড়িয়ে গেলেন সেই প্রস্তাব। অবশেষে পাঞ্চ পত্রিকার বিখ্যাত কার্টুনিস্ট ট্যানিয়েলের সঙ্গে যোগাযোগ হল তাঁর। ট্যানিয়েল বইটা দেখেই তার ছবি আঁকবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললেন। এরপর কিছুটা ট্যানিয়েল আর ছোট্ট বন্ধুদের চেষ্টাতেই ডজসন গিয়ে হাজির হলেন ছাপাখানায়। হাতে করে নিয়ে গেলেন পাণ্ডুলিপিটা; শুরু হল ছাপার কাজ। বই যখন প্রকাশের মুখে তখনও ডজসন তার ভাগ্য সম্পর্কে অনিশ্চিত। তাই লেখকের জায়গায় নিজের নামটা বসাতে দিলেন না কোনমতেই। সেখানে লেখা হল এক ছদ্মনাম লুইস ক্যারোল।

কিন্তু এমন মজা, বইটা ছেলেদের হাতে গিয়ে পৌঁছানমাত্র রাতারাতি বিখ্যাত

হয়ে গেলেন তিনি ; সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো লুইস ক্যারোলের নাম। স্বয়ং রাণী ভিক্টোরিয়া তো ঐ বই পড়ে হেসে কুটিপাটি। ডেকে পাঠালেন লেখককে। ডেকে বিস্তর প্রশংসা করলেন তাঁর। মুখচোরা ডজসন অভিভূত হয়ে পড়লেন রীতিমত। বিদায় জানানোর আগে রাণীমা একখানা বই লিখে ফেলতে অনুরোধ করলেন তাঁকে। যথা আজ্ঞা। দু-এক মাসের মধ্যেই ডজসন বই লিখে ফেললেন একখানা ; লেখার সঙ্গে সঙ্গে তার এক কপিও পাঠিয়ে দিলেন মহারাণীকে। কিন্তু বই খুলে রাণীমার চক্ষুস্থির। জটিল অঙ্কশাস্ত্রের এক বই পাঠিয়েছেন চার্লস ডজসন। ঐ বিষয়েও তো পাণ্ডিত্য কম নয় তাঁর !

ইচ্ছে

বারীন বসু

দুপুরে যখন জ্বলে চারিদিক,
খোকা একমনে ছবি আঁকে ঠিক।
দাদা দিদি বলে, 'পেটো অবতার,
ছবি কাকে বলে ভোলাবি এবার ?
এই তোর নদী, এই তোর গাছ ?
মুখখানা এযে বাংলার পাঁচ !'
কিংবা সে যদি করে গুণ গুণ
দাদা দিদি মিলে হেসে হয় খুন :
'ওরে তানসেন থামা তোর গান
ঝালাপালা হল আমাদের কান।'
খোকা সারাদিন ভাবিয়া আকুল,
ইচ্ছে থাকা কি এতটাই ভুল ?

কেশবতী কন্যা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

এক গাঁয়ে এক চাষী ছিল চাষী আর চাষী-বৌ, তাদের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। তাদের তাই মনে সুখ ছিল না।

চাষীর বাড়ীর পিছনেই ছিল এক বুড়ীর বাগান। বাগানে গাছে গাছে ফল ধরতো, গাছে গাছে ফুল ফুটতো। বাড়ীর জানালা দিয়ে চাষী-বৌ বাগানের পানে তাকিয়ে থাকতো। একদিন তার চোখে পড়লো সেই বাগানে অনেক গাজর-গাছ হয়েছে। সে চাষীকে বললো—এই গাজর এনে দেবে, আমি খাবো।

বাগানের মালিক বুড়ী ছিল বড় খিট্‌খিটে, কেউ কিছু খেতে চাইলে সে দিত না। চাষী তাই রাতের অন্ধকারে পাঁচিল টপকে বাগানে গেল। গাজর চুরি করে আনলো। বউ সেই গাজর খেয়ে ভারী খুশি, বললো—চমৎকার!

দুদিনেই সেই গাজর খাওয়া শেষ হলো। চাষী-বৌ বললো—আবার গাজর নিয়ে এসো।

চাষী আবার গেল রাতের অন্ধকারে গাজর চুরি করতে। সেই পাঁচিল টপকে নেমেছে, দেখে সামনেই সেই বুড়ী। বুড়ী বললো—তুই আমার বাগানে নেমেছিস্ কোন্ সাহসে?

চাষী বললো—আমার বৌ গাজর খেতে চাইল তাই। তুমি চাইলে তো দেবে না।

—তা'বলে চুরি করবি?

চাষী চুপ করে রইল।

বুড়ী বললো—তুই কি আমার কাছে কখনো চেয়েছিস? তোর বৌ কত গাজর

খাবে খাক্ না, আমি দোব, তবে একটা কথা, তোমার যে ছেলে হবে, সেই ছেলেটি আমার চাই, আমি তাকে ছেলের মত মানুষ করবো।

চাষী বললো—বেশ, তাই দোব।

বুড়ী চাষীকে অনেক গাজর দিল খেতে।

কিছুদিন পরে চাষীর এক মেয়ে হলো। বুড়ী এসে বললো—ওই মেয়ে আমাকে দাও, আমি ওকে মানুষ করবো।

চাষীর কোন কথাই শুনলো না, বললে—তুই গাজর চুরি করতে গিয়ে কথা দিয়েছিস্ তোকে কথা রাখতে হবে।

বুড়ী মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল।

বুড়ী মেয়েটিকে মানুষ করতে লাগলো। তার নাম রাখলো কেশবতী। দিনে দিনে কেশবতী বড় হয়ে উঠলো। চাঁদের মত তার রূপ হলো। বুড়ী তখন তাকে বাড়ীর চিলেকোঠায় থাকতে দিল। সে ঘরে ওঠার না আছে কোন সিঁড়ি, নীচে নামার না আছে কোন পথ। কেশবতী জানালার ধারে বসে থাকে আর আপনমনে গান গায়।

বুড়ীর যখন ইচ্ছে হয় সেখানে যাবার, জানালার নীচে এসে বলে—কেশবতী, কেশবতী, ঝুলিয়ে দাও কেশ!

কেশবতীর মাথায় ছিল অফুরন্ত চুল। সেই চুল সে জানালা দিয়ে ঝুলিয়ে দিত। বিশ হাত লম্বা চুল এসে পড়লো নীচে; বুড়ী সেই চুল বেয়ে উপরে উঠে গেল, জানালা দিয়ে ঢুকতো কেশবতীর ঘরে।

এইভাবেই কত দিন, কত মাস ঘুরে গেল।

একদিন রাজপুত্র সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, কেশবতীর গান শুনে সে অবাক হলো। দেখে চিলেকোঠার জানালায় বসে একটি মেয়ে গাইছে। কিন্তু সে ঘরে যাবার কোন পথ নেই।

রাজপুত্র দেখেশুনে বাড়ী ফিরে এলো।

পরদিন আবার রাজপুত্র গেল সেখানে। আবার গান শুনলো। ঘুরে ফিরে দেখলো সেই ঘরে যাবার কোন পথ নেই। তাহলে কি ওই চিলেকোঠায় মানুষ যায় না? মেয়েটা খায় কি?

রাজপুত্র সময় পেলেই সেখানে যায়, আড়ালে থেকে নজর রাখে সেখানে মানুষ যাঁয় কিনা !

একদিন রাজপুত্র দেখলো সেই বুড়ী এসে বলছে—কেশবতী, কেশবতী ঝুলিয়ে দাও কেশ !

কেশবতী চুল ঝুলিয়ে দিল, বুড়ী চুল ধরে উঠে গেল।

রাজপুত্রও পরদিন সেই চিলেকোঠার জানালার নীচে এসে ডাক দিল—কেশবতী, কেশবতী, ঝুলিয়ে দাও তো কেশ !

কেশবতী চুল ঝুলিয়ে দিল, রাজপুত্র সেই চুল বেয়ে উপরে উঠলো।

কেশবতী রাজপুত্রকে দেখেই চমকে উঠলো, বললো—তুমি কে ?

রাজপুত্র বললো—আমি রাজার ছেলে। তুমি কে ? তুমি এখানে এমনভাবে আছ কেন ?

—আমি চাষীর মেয়ে, ডাইনী বুড়ী আমাকে এখানে আটকে রেখেছে।

—চল, আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবো।

—কি করে নিচে নামবো ? তুমি কালকে রেশমী সুতো নিয়ে এসো আমি তার দড়ি পাকিয়ে সিঁড়ি তৈরী করে নেবো।

রাজপুত্র পরদিন কেশবতীকে রেশমী সুতো দিয়ে এলো। কেশবতী সিঁড়ি বুনতে বসলো।

বুড়ী ডাইনী এসে জিজ্ঞেস করলো—ওটা কি রে ?

—একটা রেশমের সিঁড়ি বুনছি, ওঠানামার জন্য।

—রেশমের সিঁড়ি ? রেশম পেলি কোথায় ?

—রাজপুত্তুর এনে দিয়েছে।

—রাজপুত্তুর ? কে রাজপুত্তুর !

—তাতো জানি না।

—কেমন করে এখানে এলো ?

—কেন যেমন করে তুমি আমার চুল ধরে আসো।

—বটে ! আমি জানতাম কেউ এখানে আসতে পারবে না। কাউকে তুই জানবি না। চিনবি না। এখানেও রাজপুত্তুর এসে জুটেছে !

বুড়ী তখনই একখানি কাঁচি দিয়ে কেশবতীর সব চুল কেটে দিলে, তারপর তাকে নিয়ে রেখে এলো এক মরুভূমিতে, বললো—এখানে না খেয়ে মর।

পরদিন রাজপুত্র এসে নিচে ডাকলো—কেশবতী, কেশবতী, ঝুলিয়ে দাও তো কেশ!

বুড়ী কেশবতীর কাটা চুল ঝুলিয়ে দিল। রাজপুত্র উপরে উঠে এসে দেখে কেশবতী নেই, আছে সেই বুড়ী। বুড়ী বললো—তুই এসেছিস্ কেশবতীকে নিয়ে যেতে? রেশমী সিঁড়ি বেয়ে সে যাবে তোর সঙ্গে? তাকে বেড়ালে নিয়ে গেছে, এবার সেই বেড়াল তার নখ দিয়ে তোর চোখ দুটোকে উপড়ে নেবে। কেশবতীকে তুই আর জীবনে দেখতে পাবি নি।

রাজপুত্রকে বুড়ী ধরতে এলো। রাজপুত্র জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো। নিচে পড়লো কাঁটা গাছের উপর। কাঁটা বিঁধে রাজপুত্রের দুটি চোখ অন্ধ হয়ে গেল। অন্ধ রাজপুত্র কাঁদতে কাঁদতে চললো যেদিকে পথ পায়।

পথে পথে রাজপুত্র ঘুরে বেড়ালো অনেক দিন। শেষে রাজপুত্র এসে পড়লো সেই মরুভূমিতে। তাকে দেখেই কেশবতী ছুটে এলো। রাজপুত্রকে অন্ধ দেখে কেশবতী কেঁদে ফেললো।

অন্ধ রাজপুত্র ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিল। কেশবতীর চোখের জল পড়লো রাজপুত্রের চোখে। রাজপুত্রের চোখ তখনই পরিষ্কার হয়ে গেল। রাজপুত্র দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।

এবার রাজপুত্র কেশবতীর হাত ধরে নিয়ে এলো নিজের রাজ্যে। রাজবাড়ীতে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। অনেক জাঁকজমক করে রাজপুত্রের সঙ্গে কেশবতীর বিয়ে হয়ে গেল। কেশবতীর আর কোন দুঃখ রইল না।

আর সেই বুড়ীর কি হলো তা কেউ জানে না।

[জার্মান রূপকথা]

———

নির্বাক যাত্রী

শ্রী বিমল দত্ত

তখন মধ্যরাত্রি। ট্রেন ঝুম্ ঝুম্ করে এসে দাঁড়ালো একটা ছোট্ট স্টেশনে। অন্ধকারে ডুবে আছে স্টেশনটা। ভূতের মত প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে আছে এক সারি গুড়চী গাছ। পাশাপাশি দুটো গাছে ঢেউখেলানো টিনের উপর আলকাতরা দিয়ে স্টেশনের নাম লেখা—ঝুল কালিনগর। দুটো পোস্টের মাথায় কাচের বাক্সের মধ্যে দুটো ল্যাম্প জ্বলছে অজস্র ভুষো উড়িয়ে।

স্টেশনে লোকজন নেই। একটিমাত্র অসুস্থ যাত্রীকে তুলে দিতে এসেছে তিনজন আত্মীয়। অসুস্থ লোকটার মাথায় ঢাউস্ ক্যাপ, গায়ে মোটা গিদ্‌ধড় কোট, গলায় কম্ফার্টার জড়ানো—হাতে দস্তানা, পায়ে মোজা আর মিলিটারী বুট্। তাকে ঠেলেঠুলে অতি সাবধানে একটা খালি কামরায় কোণের দিকে ঠেসেঠুসে বসিয়ে দিয়ে আত্মীয়রা অত্যন্ত সন্দেহজনক ব্যস্ততায় নেমে গেল। রুগ্ন লোকটার সঙ্গে কেউই গেল না।

ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজলো—যে ঘণ্টা বাজালো সে যেন ঘুমে ঢুলে পড়ছে—শব্দটাও ঘুমের মধ্যে শোনা শব্দর মত। ট্রেন ছুটতে লাগলো। প্রায়ান্ধকার কামরায় অসুস্থ লোকটার শরীর গাড়ীর তালে তালে দুলছে—মাথাটা ঘট্‌ঘট্ করে নড়ছে—ঘুমন্ত শরীরটা ঝুঁকে রয়েছে সামনের দিকে। কেমন যেন আচ্ছন্ন ভাব তার—হয় লোকটি দারুণ অসুস্থ, না-হয় মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে রয়েছে। মাত্র—তিন মিনিট লাগ্‌ল সমস্ত ব্যাপারটা ঘট্‌তে। লোকটির সঙ্গীরা যেন কেমন অভদ্র ব্যস্ততায় কোনরূপ বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত অসুস্থ লোকটিকে একা রেখে হন্তদন্ত হয়ে নেমে স্টেশনের অনন্ত অন্ধকার-সমুদ্রে ডুবে গেল।

পরের স্টেশনের নাম "নিঝুমপুর"। সেখানে ট্রেন থামল। একটি মাত্র যাত্রী উঠলো ট্রেনটিতে। যাত্রীটি ঐ কামরাটিতেই উঠ্‌লো। তার সঙ্গে রাজ্যের মালপত্র, বাক্স-বিছানা, পুঁট্‌লি-পাঁট্‌লা—সব মাল একাই বয়ে কামরার মেঝেতে ধপাধপ্‌ ফেলে সে ট্রেন ছাড়তে না ছাড়তেই তড়াক্‌ করে উঠে এলো। এক নজরে প্রথম যাত্রীটিকে দেখে সে বাঙ্কে, আসনের তলায় আশেপাশে মালপত্রগুলো গুছোতে লাগ্‌ল। তারপর সব গুছোনো হলে পকেট থেকে পেল্লায় টেবল ক্লথের মত একটা রুমাল বার করে মুখ মুছে সেইটি বিছিয়ে লোকটি সেই অসুস্থ যাত্রীটির ঠিক উল্টো দিকের আসনে আরাম করে বসলো।

একবার তাকালো প্রথম যাত্রীটির দিকে। তার ঘাড়টা ট্রেনের গতির সঙ্গে ঘট্‌ ঘট্‌ করে নড়ছে।

দ্বিতীয় যাত্রীটি ভাবলো লোকটিকে ঘুমে ধরেছে। সে তাকে জাগিয়ে নির্জনতা ভঙ্গ করবার জন্যে বলে উঠলো, "ও মশাই, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?"

কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। গভীর নিদ্রার অতলে বোধহয় তার ডাক পৌঁছল না।

দ্বিতীয় যাত্রী জলের বোতলের ছিপি খুলে ঢক্‌ঢক্‌ করে খানিক জল খেল। তারপর সামনের যাত্রীটির দিকে নজর দিল। লোকটি দারুণ ঘুমোচ্ছে—টুপীটা প্রায় তার মুখের উপর ঝুলে এসেছে—দস্তানা-পরা হাত দুটো গিদ্‌ধড় কোটের পকেটে ঢোকানো—মাথাটা ট্রেনের গতিতে তার দেহের সঙ্গে তাল রেখে দুল্‌ছে।

নিঝুম রাত, ট্রেনের কামরায় সঙ্গী রয়েছে তবু কইতে পারছে না—দ্বিতীয় যাত্রীটির কেমন নিঃসঙ্গ বোধ হতে লাগলো। ভাবল ওকে জাগাতেই হবে। দু-একটা কথা কইতেই হবে।

দ্বিতীয় যাত্রী কয়েকটা প্রশ্ন করে উত্তর পেল না। তখন সে বাংলা ছেড়ে ইংরেজীতে প্রশ্ন করলো—কোন উত্তর না পেয়ে এবার প্রশ্ন করলো হিন্দীতে। কিন্তু কোন উত্তরই পেল না সে। লোকটার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত ও কিছুটা ক্রুদ্ধ হল দ্বিতীয় যাত্রী। লোকটি স্বভাবতঃ নাছোড়বান্দা প্রকৃতির। সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। পকেট থেকে মার্কোভিচ্‌ সিগারেটের টিন বার করে পকেট হাতড়ে দেশলাই খুঁজতে খুঁজতে টিনটা প্রথম যাত্রীর দিকে এগিয়ে ধরে বললে, "একটা ইচ্ছে করুন—ঘুম ছেড়ে

যাবে।" দ্বিতীয় যাত্রী আশা করতে লাগলো গিদ্‌ধড় কোটের পকেট থেকে দস্তানা পরা একটা হাত টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নেবে। কিন্তু কই, লোকটি তখনো কোন সাড়া দিল না।

পকেটে দেশলাই না পেয়ে দ্বিতীয় যাত্রী বলে উঠলো, "দেশলাইয়ের জন্যে কি আপনাকে একটু বিরক্ত করতে পারি?" তাতেও কোন উত্তর এল না।

দ্বিতীয় যাত্রীর মাথায় রাগটা চন্‌চনিয়ে উঠলো। এরকম বেয়াদফ লোক সে জীবনে আর দেখে নি। সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বন্য বরাহের মত সে প্রথম যাত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে সজোরে কয়েকবার ঝাঁকানি দিয়ে ছেড়ে দিতেই লোকটি গড়িয়ে পড়লো সশব্দে কামরায় মেঝেতে। কিন্তু একী? তবুও লোকটি নড়ে চড়ে না কেন?

দ্বিতীয় যাত্রী নেড়ে চেড়ে, উল্টে পাল্টে যা দেখলো তাতে তার বুক উড়ে গেল। হঠাৎ রাগের বশে একী করলো সে? লোকটি যে মরে গেল! তার মুখ ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে উঠলো—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

ট্রেন তখন একটা রেলওয়ে সেতুর উপর দিয়ে চলেছে—নিঃশব্দ রাত্রের বুকে কে যেন সজোরে বারবার ছুরিকাঘাত করছে—গুম্ গুম্—গুম্ গুম্—গুম্ গুম্……

দ্বিতীয় যাত্রী কাজের লোক। করিতকর্মা। লোহার মত শক্ত তার স্নায়ু। মুহূর্তে ইতিকর্তব্য স্থির করে সে উঠে দাঁড়িয়ে ট্রেনের দরজা হাট করে খুলে দিলে। তারপর প্রথম যাত্রীর মৃতদেহ টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে, অন্ধকারের মধ্যে সেটা ঠেলে ফেলে দিলে। চলন্ত ট্রেনের শব্দে সেই মৃতদেহ পড়ার শব্দ মিলিয়ে গেল। ট্রেন ছুটে চললো।

দ্বিতীয় যাত্রী তার আসনে ফিরে এসে তার সুটকেস খুলে সিগারেট লাইটার বার করে ধরিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ধুমপান করতে লাগলো।

ভোরে ট্রেন এসে হাওড়ায় পৌঁছল। প্ল্যাটফর্ম ভর্তি লোকের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী লোক খুঁজে খুঁজে সেই কামরায় এসে উঠলেন।

কিন্তু কামরায় তিনি যাকে খুঁজছিলেন তাকে না দেখে দ্বিতীয় যাত্রীকে জিগ্যেস করলেন, "মশাই কিছু মনে করবেন না, এ কামরায় কি আপনি বরাবর একলাই আসছেন?"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন, "না ত! আমার আগেই একজন যাত্রী এতে উঠেছিলেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু তিনি কোথায় গেলেন?"

মার্কোভিচের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দ্বিতীয় যাত্রী বললেন, তিনি দু তিন স্টেশন আগেই নেমে গেছেন।"

টানাটানা সুরে লোকটি বলে উঠলেন, "য়্যাঁ! নে—মে—গে—ছে—ন!"

সঙ্গে সঙ্গেই অনুসন্ধানকারী—অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

———

ছড়া

সলিল মিত্র

তাক কুড়্ কুড়্ তাক কুড়্কুড়্
ঢোলক বেজেছে—
নোলক নাকে মুনকি রাণী
নাচতে লেগেছে!
নাচের বহর দেখে সবাই
হেসেই হল খুন,—
কেউ কি জানে মুনকি রাণীর
এতোই আছে গুণ!
হাত ঘুরিয়ে পা ঘুরিয়ে
নাচের বাহার কী!
নোলক নাকে মুনকি রাণী
এ্যাত্তোটুকুনটি!

———

বুমেরাং

বেলা দেবী

ভোর না হতেই ঘুম ভেঙে যায় নানুর দরজা খুলে সে বাইরে আসে। তারপর পায়ে পায়ে ছাতে। ছাতের একপাশে অনেকগুলো ফুলের টব। বেলফুলের চারাগুলোতে বেশ কয়েকটা ফুল ফুটেছে। নানু গুনলো—এক দুই তিন চার···এগারোটা। এগারোটা ফুল ফুটেছে। বেশ বড় বড় ফুলগুলো। নানু টবের উপর ঝুঁকে ফুলের গন্ধ নেয়, ফুল ছেঁড়ে না। অত দুষ্টু ছেলে নয় নানু।

হঠাৎ নানু কান খাড়া করলো। কেমন একটা আওয়াজ। খুব ক্ষীণ সুরে কি যেন ডাকছে। কোন পাখি না কি! এদিক ওদিক তাকিয়ে আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল নানু। দেখে কি—ভাঙা একটা ড্রামের পেছনে—আরে বেড়ালটার একটা বাচ্চা হয়েছে যে। ও মা, কেমন সুন্দর, সাদা ধব্‌ধবে, নরম তুল্‌তুলে। আর কি সুন্দর টুল্‌টুলে দু'টো চোখ! ওটাই খুব ক্ষীণ গলায় উঁ উঁ করে ডাকছে।

নানু ভয়ে ভয়ে বাচ্চাটার গায়ে হাত দিলো। ওর মা'টা আবার না ফ্যাঁস করে ওঠে। না, মা বেড়ালটা গম্ভীরভাবে একবার তাকিয়ে আবার চোখ বুজলো। নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে নানু তার বাচ্চার কোন ক্ষতি করবে না। আদর করছে। নানু আস্তে আস্তে বাচ্চাটার গায়ে হাত বুলোয়। আঃ, কি নরম! কি নরম!

হঠাৎ নানুর মনে হলো বাচ্চাটার নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে। একটু দুধ এনে দিলে হয় না। মনে হতেই এক লাফে নীচে। মাকে বললো—মা, আমার দুধ কই দাও। আমি দুধ খাব।

মা বললেন—আজ যে এত সুমতি হয়েছে! রোজ তো দুধ খাওয়া নিয়ে মারামারি করতে হয় তোমার সঙ্গে। ও কি, দুধের গ্লাস নিয়ে কোথায় চললি?

নানু ততক্ষণে ছাতের আদ্দেক সিঁড়িতে। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বললো—আমি ছাতে বসে দুধ খাব্।

ছাতে উঠেই পুরো দুধটা ধরে দিলো বেড়ালছানার মুখের সামনে। বাচ্চাটা খুশিতে মিউ মিউ করে ডেকে উঠলো। তারপর জিভ দিয়ে চুকচুক করে দুধটা খেতে লাগলো। আনন্দে উত্তেজনায় চোখ বড় করে তাকিয়ে রইল নানু। সেই থেকে রোজ সকালে নানুর এক কাজ হয়েছে। বেড়াল বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো। আর বাচ্চাটা ওর যা ন্যাওটা হয়েছে না! নানু ছাতে গেলেই পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে।

সকালবেলা দুধ জ্বাল হতে দেরী হলে নানুর যেন আর তর সয় না। তার এহেন দুগ্ধপ্রীতি দেখে সবাই অবাক। তার উপর আবার দুধের কাপ নিয়ে ছাতে যাওয়া। ওর ছোড়দির কেমন যেন সন্দেহ হলো। তাই একদিন চুপিচুপি সেও ছাতে এসে হাজির। বললে—ওমা, তুই বেড়ালছানাকে দুধ খাওয়াচ্ছিস! তাই সকালবেলা দুধের জন্য অত তাড়া। রোজ ছাতে দুধ নিয়ে আসা। দাঁড়া মাকে গিয়ে বলছি। সেই থেকে নানুর দুধ নিয়ে ছাতে আসা বন্ধ। মা'র কড়া হুকুম—আমার সামনে বসে দুধ খেতে হবে।

ইতিমধ্যে বাচ্চাটা একটু বড় হয়ে উঠেছে। বেড়ালমাসী তার ছানা নিয়ে খাবারের খোঁজে এঘরে-ওঘরে রীতিমত উৎপাত শুরু করল। আজ দুধের কড়ায় মুখ, কাল মাছের থলেয় মুখ, আর একদিন হয়তো সন্দেশের বাক্সটাই শেষ। মা কাকিমা তো রেগে অস্থির। বাড়িতে কাজ করে ভোলা। মা তাকে ডেকে বললেন—এই ভোলা, বস্তায় পুরে মা আর ছা দু'টোকেই বিদেয় কর তো। বাড়ি থেকে অনেক দূরে ছেড়ে দিয়ে আসবি। যেন আর ফিরে আসতে না পারে, বুঝলি?

নানু প্রবল আপত্তি জানালো—না না মা, তাড়িয়ে দিও না। দুধ মাছ ঢাকা দিয়ে রাখলেই তো ওরা আর খেতে পারবে না।

কাকিমা বললেন—খুব পারবে, ধাড়ি বেড়ালটা যা দস্যি! ঢাকনা সরিয়ে ফেলেও কত সময় খেয়ে নেয়।

নানু অনুনয়ের গলায় বললো—তাহলে শুধু বাচ্চাটাকে রেখে দাও কাকিমা, ওকে তাড়িয়ে দিও না।

মা ধমকে উঠলেন--দাঁড়াও, তোমার বেড়ালছানা নিয়ে খেলা করা বের করছি। নানু একটা লাল ফিতে কিনে এনেছে। একটা ছোট্ট ঘন্টি ও এনেছে। লাল ফিতে দিয়ে সেটা বাচ্চাটার গলায় বেঁধে দিয়েছে। ধব্‌ধবে সাদা রঙের উপর লাল ফিতেটা যা চমৎকার মানিয়েছে না! বাচ্চাটা দৌড়ালে ঘন্টিটা কেমন টুং টুং করে বাজে। আর নানুকে যা ভালবাসে না! তাকে দেখলেই মিউ মিউ করে ডেকে ডেকে পায়ে পায়ে ঘুরবে।

স্কুল থেকে ফিরে নানু বেড়াল দুটোকে দেখতে পেলো না; 'আপদ দুটো' তাহলে সত্যিই বিদেয় হয়েছে! মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল নানুর।

বিকেলবেলা বাড়ির সামনের রকে বসেছিল ভোম্বল, সন্টু, ইন্দির আর ধনু। ভোম্বল এক ঠোঙ্গা ডালমুট কিনে এনেছে। ওরা সবাই মিলে মুঠো মুঠো করে তাই খাচ্ছিল, আর গল্প করছিল। হঠাৎ ইন্দির লাফিয়ে উঠলো—দেখেছিস, দেখেছিস, কাণ্ডটা দেখেছিস! ওরা সবাই হক্‌চকিয়ে গেল—কি হয়েছে? কি হল?

উত্তেজিত গলায় ইন্দির বললো—একটা লোক বস্তায় পুরে এনে আমাদের বাড়ির সামনে দুটো বেড়াল ছেড়ে দিয়ে গেল।

ওরা সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। সন্টু বললো—তুই তো ইন্দির, 'ইন্দুর' তো নোস যে বেড়াল দেখে ধড়ফড় করছিস।

ওরা সবাই আবার হেসে গড়িয়ে পড়লো।

ইন্দিরের নামটা ইন্দ্র থেকে ইন্দির হয়ে গেছে।

ইন্দির বললো—'আরে! দাঁড়া তো, দেখছি—

ইন্দির তীরবেগে ছুটলো, না···বাড়ির দিকে নয়···বড় রাস্তার দিকে। ধনু বললো—ইন্দিরটা পাগল না ক্ষ্যাপা রে।—ওরা আর এক দফা হেসে উঠলো। ভোলা বেড়াল ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল। ট্রাম এসে দাঁড়াতেই ট্রামে উঠে পড়লো সে। পেছন থেকে ছুটতে ছুটতে ইন্দিরও এসে টকাস্ করে উঠে পড়লো ট্রামে। বস্তা হাতে ভোলাকে সে এক নজরেই চিনে নিয়েছিল।

ভোলার ঠিক পাশটিতে এসে দাঁড়ালো ইন্দির। কণ্ডাক্টার টিকিট চাইতে এলে ভোলা একখানা তেরো পয়সার টিকিট কাটলো। তাই দেখে ইন্দিরও তেয়ো পয়সার টিকিট কাটলো। ভাগ্যিস ফুচকা খাওয়ার জন্য চার আনা পয়সা পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিল। এক সময় ভোলা ট্রাম থেকে নামলো। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরও নেমে পড়লো। অনুসরণ করতে লাগলো ভোলাকে। ভোলা বাড়িতে ঢুকে গেলে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে পড়লো ইন্দির। ঠিকানাটা দেখে নিল। হুঁ, চেনা গেল এই বাড়িটা। এই বাড়ির বেড়াল!

ভেতর থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এলো—কিরে ভোলা, দূরে ছেড়ে দিয়ে এসেছিস তো?

হ্যা মা, টেরামে করে আর এক মল্লুকে ছেড়ে দিয়ে এইচি।

চলে আসবে না তো আবার?

কি যে বলেন মা, সাতজন্মেও আসতে পারবে নি। বেড়াল কি টেরামে চড়তে পারে?—ভোলা হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগলো।

ইন্দির মনে মনে বললো—দাঁড়াও, দেখাচ্ছি বেড়াল টেরামে চড়তে পারে কি পারে না। বেড়াল টেরামে চড়ে যেভাবে ও পাড়ায় গেছে তেমনি করেই এ পাড়ায় ফিরে আসবে। আজকে রাত্তিরেই ফিরে আসবে। ভগবান সহায় ইন্দিরের বাবা আজ বাড়ি নেই। দু'দিনের জন্য অফিসের কাজে বাইরে গেছেন। বাবা থাকলে রাত করে বাড়ি থেকে বেরোনো যায় না।

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। ইন্দির বাড়ি ফিরে সেই একই প্রথায় বস্তায় পুরে বেড়াল নিয়ে ট্রামে উঠলো।

সকালবেলায় ছাতে বেড়ানো নান্নুর বরাবরের অভ্যেস পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নান্নু ছাতে গেল। মনটা খুব খারাপ। বেড়ালছানাটাকে সে সত্যিই খুব ভালোবেসে ফেলেছিল।

ছাতে উঠে নান্নু অবাক, একি! এক কোণে গুড়িসুড়ি মেরে যে ওরা দুজনেই ঘুমচ্ছে। মা আর বাচ্চা। নান্নু এক ছুটে ওদের কাছে এগিয়ে গেল। নান্নুকে দেখে বাচ্চাটারও কি আনন্দ! তার পায়ের চারপাশে ঘুরে ঘুরে মিউ মিউ করে ডাকতে

লাগলো। নান্নু বসে পড়ে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বললো, কি করে এলি রে পুষি। বাড়ি চিনলি কি করে? দাঁড়া, তোর জন্য দুধ নিয়ে আসি।

নিচে এসে নান্নু বললো—মা, দুধ দাও। তারপর দুধের গ্লাস নিয়ে চললো ছাতে। মা বললেন, দুধ নিয়ে আবার ছাতে যাচ্ছিস যে। ছোড়দি বললো—যাক না, আজ তো আর ছাতে বেড়াল নেই যে বেড়ালকে খাওয়াবে।

নান্নু মনে মনে হেসে কুটিকুটি, পুষির সামনে পুরো দুধটা ধরে দিয়ে বললো—নে পুষি, দুধ খা। তবে তো গায়ে জোর হবে। আবার যদি ভোলা ধরতে আসে নির্ঘাৎ পালাবি কিন্তু। বুঝলি? গায়ে জোর না থাকলে পালাবি কি করে?

চির শরৎ

গোপাল ভট্টাচার্য

কুন্দ ফোটা বনের পথে
কচি ধানের শ্যামল ক্ষেতে
উজল আকাশে,
অতীত সে কোন সুদূর হতে,
যেন ভরা নদীর স্রোতে
শরৎ ফিরে আসে।
দূর্বা ঘাসের সবুজ আসন
দোয়েল শ্যামার মধুর ভাষণ
জ্যোৎস্না ঝরা রাতি।
শিউলি ঝরা অরুণ প্রাতে
উমা আসেন এই মরতে
শোভে বিমল ভাতি।

এই শরতের আগমনী
গাইল কত বাউল গুণী;
আজো যে সেই সুরে শুনি
একতারাটি বাজে,
নদীর ধারে কাশের বনে
প্রজাপতি আপন মনে
উড়ে উড়ে বেড়ায় ঘুরে
কি জানি কোন কাজে।
এই শরতে চিরদিনই
ঢাকের বাদ্য অমনি শুনি
পূজার দেউল তলে,
মৃন্ময়ী মার চরণ হেরি
সকল বঙ্গ সন্তানেরি—
নয়ন ভাসে জলে॥

ট্রামগাড়ীর গল্প

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

কলকাতার রাস্তা কাঁপিয়ে ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে যখন লোক-বোঝাই ট্রাম-গাড়ীগুলো চলতে থাকে তখন সদ্য-গাঁ-থেকে আসা দেহাতী লোকেরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। শহরের ভিতর দিয়ে ক্ষুদে রেলগাড়ীর মত দু-কামরা গাড়ী, যা নাকি রেলগাড়ীর মতই লাইনের ওপর দিয়ে ছুটে চলে,—তা এখনও তাদের কাছে বিস্ময়ের খোরাক।

ট্রামগাড়ী নাম হল কেন বলতে পার? ট্রাম মানে কাঠের বরগা। আমেরিকার লোকেরাই নাকি ঐ নামটা দিয়েছিল আর সব-প্রথম ট্রামগাড়ীর চলন হয় ঐ আমেরিকারই নিউইয়র্ক শহরে, আজ থেকে ১৪২ বছর আগে। ঐ গাড়ী রেলগাড়ীর মতই লাইনের ওপর দিয়ে চলত, কিন্তু সে লাইন লোহার ছিল না, ছিল কাঠের। লোহার তৈরি লাইনকে বলা হয় রেল, আর ঐ রেল দিয়ে তৈরি রাস্তাকেই বলা হয় রেলওয়ে। কাজেই ট্রাম দিয়ে তৈরী রাস্তার নাম হল ট্রামওয়ে আর গাড়ীর নাম হল ট্রামগাড়ী। পরবর্তী কালের কাঠের লাইনের বদলে ট্রামও লোহার লাইনের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করে, কিন্তু নামটা আর বদলানো হয় নি।

আমেরিকার পরে ট্রামগাড়ীর চলন হয় ফ্রান্সের প্যারিস শহরে (১৮৫৫) আর তারপর ইংলণ্ডের লণ্ডনে (১৮৬০)। আমাদের কলকাতায় প্রথম ট্রাম চলতে থাকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সে ছিল মাল-টানা ট্রাম। যাত্রীবাহী ট্রাম চলতে শুরু করে আরও পরে, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে।

প্রথম যখন কলকাতায় ট্রামগাড়ীর চলন হল তখন তাকে সত্যিকারের ট্রামগাড়ীই বলা চলে, কারণ ওরও লাইনগুলো ছিল কাঠের তৈরি। শহরের মাত্র দু' মাইল রাস্তা জুড়ে সে গাড়ী চলত। কিন্তু তাতে লোক বইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, এখনকার লরীর মত মাল বয়ে নেওয়াই ছিল তার কাজ। একটি তেজিয়ান ঘোড়া সেই গাড়ী টেনে নিয়ে ছুটত। লাইন পাতবার কারণ আর কিছু না তখনকার এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় তেজী ঘোড়াদের পক্ষেও ভারী ওজনের গাড়ী টানা বড় সহজ ছিল না। রাস্তা যত মসৃণ হবে গাড়ীর চাকা তত সহজে ঘুরবে। এইজন্যই লাইনের দরকার। সমস্ত রাস্তাটা

তো আর লাইনের মত মসৃণ করা যায় না তাই শুধু চাকাগুলোর প্রয়োজন মত জায়গা নিয়ে লাইন বসানো। ২টি লাইনের মধ্যে ব্যবধান ছিল ৩ ফুটের একটু বেশি—৩ ফুট ৩½ ইঞ্চি। শোনা যায় সরকার আর রেল কোম্পানী একমত হয়ে এর যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন।

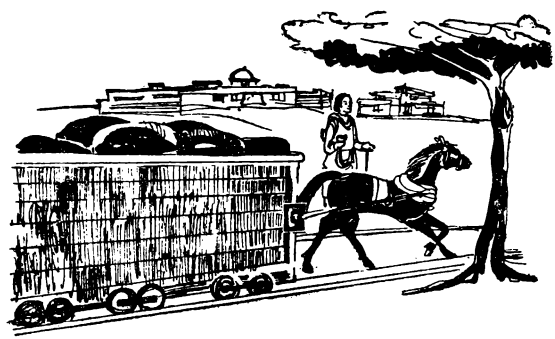

কিন্তু হলে হবে কি, সে ট্রাম মাস কয়েকের বেশি চলে নি। লোকসান শুরু হতেই বন্ধ করে দিতে হয় তারপর প্রায় ৬।৭ বছর ট্রাম লাইনগুলিই শুধু পড়ে রইল, ট্রামের আর পাত্তা নেই।

তখন এগিয়ে এল একটি বিলিতী কোম্পানী। তারা ভার নেবে কলকাতার ট্রামওয়ের। নতুন করে লাইন টাইন সাফ করা হল। কোম্পানীর কর্তারা বললেন, শুধু মাল নয়, এবার ট্রামে যাত্রীদেরও নিতে হবে। এবং শেষ পর্যন্ত মাল টানা একদম উঠে গিয়ে যাত্রী আনা-নেওয়ার জন্যই ট্রাম চলতে লাগল।

কি রকম দেখতে ছিল সে ট্রাম। তার একটা নমুনা কলকাতার বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামে আছে। গাড়ীর মাথার ওপর ছিল শুধু একটা চাল আর চারধার সব ফাঁকা। ভিতরে ৮।১০ জন লোকের বসবার মত বেঞ্চি পাতা, পাশে লম্বা পাদানীর ওপর দাঁড়িয়ে থাকত কণ্ডাক্টার। গাড়ীর সামনে বসত কোচম্যান্। বলা বাহুল্য তখনও ঘোড়া দিয়েই ট্রাম টানানো হত।

খুব তেজীয়ান ওয়েলার ঘোড়া ব্যবহার করা হত এ জন্য। তাও অত ভারী গাড়ী টানতে তারাও গলদঘর্ম হয়ে যেত। খানিক দূর গিয়েই ঘোড়া বদল করে অন্য ঘোড়া যুতে দেওয়া হত। তাই ট্রামওয়ের মাঝে মাঝেই থাকত আস্তাবল। ডাছাড়া ঘোড়ার জল খাবার জন্য পথের মাঝে মাঝে লোহার বড় বড় চৌবাচ্চাও রাখা হত। সে চৌবাচ্চার কিছু কিছু এখনও চৌরঙ্গীতে দেখতে পাওয়া যায়। এসব সত্ত্বেও কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রচুর ঘোড়া সর্দিগর্মী হয়ে মারা যেত।

তখন কর্তারা ঠিক করলেন ঘোড়ায় টানা গাড়ীর পাশাপাশি ষ্টীম এঞ্জিনে টানা

ট্রামও চালাবেন এবং চালালেনও। প্রথমে খিদিরপুরে এবং শেষে চৌরঙ্গী অঞ্চলে এরকম ট্রামও চলতে লাগল কিন্তু শুধু দিনের বেলা। সন্ধ্যার আগেই সে ট্রাম বন্ধ করে দেওয়া হত, সে যুগের অল্প আলোর রাস্তায় দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য। তাছাড়া ট্রামের ঘোড়াগুলোও ষ্টীম এঞ্জিনের বিকট শব্দ বরদাস্ত করতে পারত না।

তবু ঐভাবে চলতে লাগল ট্রাম। একটা পুরোনো হিসেবে দেখেছি তখনই কলকাতায় ট্রাম রাস্তা হয়ে গিয়েছিল প্রায় ১৯ মাইল আর সব মিলে ১৮৬ খানা ট্রাম চলত তার ওপর দিয়ে। ১৯৩৬ সালে ট্রাম রাস্তা বেড়ে গিয়ে হয় ৩৩ মাইল।

ইতিমধ্যে কাঠের বরগার বদলে লোহার লাইন চালু হয়ে গেছে। ট্রাম খুব জনপ্রিয়ও হয়েছে। প্রচুর লাভ হচ্ছে কোম্পানীর। তাই তাঁরা ঠিক করলেন, ট্রামকে আরও আধুনিক করতে হবে ঘোড়ায় টানা বা ষ্টীম ইঞ্জিনে টানা ট্রাম আর চালানো হবে না—নতুন যুগের বৈদ্যুতিক ট্রামের চলন করতে হবে। ১৯০২ সাল থেকে সেই বৈদ্যুতিক ট্রাম চলতে শুরু করল কলকাতার রাস্তায়। আর এখনও তা চলছে।

সে ট্রামে থাকত ছোট ছোট খোপ, ঢুকবার পথও থাকত অনেকগুলো। কণ্ডাক্টারকে ট্রামের বাইরে পাদানীর ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত। তখনকার ট্রামগুলো ছিল হল্‌দে রং-এর, ভিতরে ভিতরে খয়েরী ছোপ। তারপর ট্রামের রং বদলে করা হয় সবুজ। তারও পরে হয় ছাই ছাই বা ক্রীম রং-এর যা এখনও চলছে। আজকাল আবার নীল রংও করা যচ্ছে। কখনও কখনও বাইরের দিকটা বিজ্ঞাপন সেঁটে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। ফার্স্ট ক্লাসের ট্রামে গদী আর পাখার ব্যবস্থাও হয়েছে অনেক পরে। সম্প্রতি আবার খুব জমকালো চেহারার প্রচুর পাখাওয়ালা ট্রাম বেরোচ্ছে, নাম দেওয়া হয়েছে "সুন্দরী"।

কলকাতায় বাসের চলন শুরু হয় ১৯২৪ কি ২৫ সাল থেকে। তখনকার বাসগুলো হত খুব ছোট,—বড় জোর ১৪ থেকে ২০ জনের বসবার মত। প্রত্যেক বাসের আলাদা নামও থাকত গায়ে লেখা—যেমন উর্বশী, আরতি, জয় মা কালী, জয় বাবা বিশ্বনাথ ইত্যাদি। এক ওয়ালফোর্ড কোম্পানী নামে এক বিলিতী কোম্পানী কিছু কিছু বড় এবং দোতলা বাস বার করেন, সে দোতলা বাসের ছাদ থাকত না, দুপুরে বা বর্ষায় কেউ দোতলায় চাপতে চাইত না, কিন্তু বিকেলের দিকে পড়ে যেত হুড়োহুড়ি।

বাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ট্রাম কোম্পানীকে নানা রকম সুযোগ-সুবিধার

নসীপুরের নিশি

কাহিনী- প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি - মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

কিন্তু বেড়ালটা? ওখানেই ত দেখেছিলাম!
তাওতো ঠিক! বেড়ালটা ওখানেই দাঁড়িয়ে ফোঁসফোঁস করছিল।
বেড়ালটা কি তোমার জন্যে বসে থাকবে? সে কখন কেটে পড়েছে।
কিন্তু কোথা দিয়ে! এ ঘরে ত একটি মাত্র দরজা তাও বন্ধ।
আমাদের ঘর দিয়ে পালালে আমরা দেখতে পেতাম নিশ্চয়ই
যাক গে বেড়াল নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই।
মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। সকলের শিরদাঁড়া বেয়ে বরফজল নেমে এলো।
কি হল!
কি ব্যাপার!
উঁ... উঁ... উঁ...
উঁ উঁ...
বসন্ত...কি হয়েছে বসন্ত!
মাথার কাছে বসে কে যেন বরফের মত ঠান্ডা নিশ্বাস ফেলছিল।

চলবে

ব্যবস্থা করতে হল, যেমন, দুপুরে বেলা ১১টা-১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত সস্তা ভাড়া (প্রায় অর্ধেক), সিজ্‌ন টিকেট, ছুটির দিনে অল্‌ ডে টিকেট ইত্যাদি।

তা সত্ত্বেও ট্রাম গাড়ী নাকি লাভজনক হচ্ছিল না। অবশেষে কোম্পানী ট্রাম তুলে দেব দেব করছেন দেখে সরকারী তত্ত্বাবধানে ট্রাম চালানো শুরু হল। এখনও তাই চলছে।

এখনও মাঝে মাঝে ট্রাম তুলে দেবার দাবী ওঠে। ট্রামের অপরাধ, ট্রাম অপেক্ষাকৃত ধীরগতি এবং অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে বলে ব্যস্ত শহরের দ্রুতগতি আটকে দেয়। বড় বড় সব শহর থেকেই নাকি ট্রাম একে একে বিদায় নিয়েছে।

তা নিয়েছে ঠিকই এবং নিক্‌ না। কিন্তু আপাততঃ কলকাতার মত বিরাট জনবহুল শহরে ট্রাম তুলে দিলে যে কি ভয়াবহ অবস্থা হবে তা একদিন ট্রাম বন্ধ থাকলেই টের পাওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ লোক আকুলি বিকুলি করতে থাকে—কি করে গন্তব্য স্থানে সময়মত যাবে এই ভাবনায়। প্রত্যহ এই শহরের লক্ষ লক্ষ লোককে এখানে ওখানে নিয়ে যায় ট্রাম। বাসের সাধ্য নেই অত যাত্রী বইবার। তাছাড়া, ট্রামে প্রচণ্ড ভিড় হলেও ততটা কষ্ট হয় না যতটা কষ্ট হয় বাসে সেই পরিমাণ ভিড় হলে। ট্রাম বাসের চাইতে অনেক আরামদায়ক, এমন কি দাঁড়িয়ে যেতে হলেও।

তাছাড়া কলকাতার ট্রাম বেশির ভাগ দেশের ট্রামের চাইতে উৎকৃষ্ট। ছেলেবেলায় দিল্লীর ট্রামে চড়েছি। এমন ছ্যাকরা গাড়ীর মত তার চেহারা যে দ্বিতীয় বার চড়তে ইচ্ছে করে না। কানপুরে যেবার প্রথম বার গেলাম, ছাত্রজীবনে,—দিব্যি ট্রামে করে ঘুরলাম। কয়েক বছর পরে গিয়ে দেখি লাইন আছে, ট্রাম নেই। টঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতে সে তো হেসেই অস্থির। শেষে সংক্ষেপে জানাল আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে লালবাতি জ্বেলেছে। বোম্বাইতেও অল্প কয়েক বছর আগে ট্রাম ছিল, উঠে গেছে। তবে সেখানে শহরের মাঝখান দিয়েই গেছে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন। তারাই বোম্বাই-এর অধিকাংশ যাত্রী বহন করে।

তবে কলকাতায় পাতাল রেল হলে ট্রামের আদর নিশ্চয়ই অনেকটা কমে যাবে। যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন বেঁচে থাকুক ট্রাম।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দরজার সামনেই আবির্ভূত হল এক পুরুষ-মূর্তি। যুবক। কিন্তু মড়ার মত পাংশুবর্ণ। দেওয়ালের গায়ে সেই ভয়ঙ্কর ছায়ার ছায়া আরো বেশি কালো হয়ে উঠল। ছায়ার উপরার্ধে জ্বলে জ্বলে উঠছে দুটো চক্ষু এবং তার দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে সোফায় বসা সেই নারী-মূর্তির দিকে।

তরফদার দেখলেন, ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নারী-মূর্তিটিও ঠিক সেই সময়ে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল।

ঘরের দরজা আর খুলল না, কিন্তু পরে কি হয় তা দেখার আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলেন।

আর সহ্য করতে পারলেন না তরফদার। একটা জীবন্ত মানুষের পক্ষে সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব। সমস্ত গা ছমছম করছে। চীৎকার করে বললেন, কে কোথায় আছো আমাকে বাঁচাও···কিন্তু গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরুল না।

পুরুষ-মূর্তি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল নারী-মূর্তির দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের কাছ থেকে সেই বীভৎস কালো ছায়াটাও অগ্রসর হয়ে তাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

অকস্মাৎ তাদের প্রত্যেকেই ঢাকা পড়ে গেল নিবিড় এক অন্ধকারের ঘেরা-টোপের মধ্যে। তারপর জ্বলে উঠল আবার একটা বিবর্ণ আলো এবং দেখা গেল সেই দুই ভূতড়ে নর-নারী মূর্তি যেন সেই অতিকায় ছায়ামূর্তির কবলগত।

নারীর বক্ষদেশে রক্তচিহ্ন, এবং সেই ভুতুড়ে পুরুষ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একখানা ভুতুড়ে তরবারির উপরে এবং তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরছে রক্ত আর রক্ত। তারপর সেই বিরাট ছায়ামূর্তির বিপুল কালিমা গ্রাস করে ফেলল সেই পুরুষ ও নারীকে।

আবার জ্বলে জ্বলে উঠল ছোট্ট ছোট্ট আলো ফানুসগুলো! আবার তারা ব্যস্তভাবে আনাগোনা ও ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক-ওদিক, উপরে নীচে সর্বত্র। তারা হয়ে উঠল আরো বেশী পুঞ্জীভূত, তাদের গতি যেন আরো বেশি বন্য ও দিগ্বিদিগ জ্ঞানহারা।

মূর্তি ধারণ করল এক বৃদ্ধা নারী—আর দেখা গেল টেবিলের উপর থেকে যা অদৃশ্য হয়েছিল, সেই চিঠি দুখানা তার হাতে রয়েছে। তারপরেই নারী-মূর্তির পায়ের তলায় মেঝের উপরে আর এক দৃশ্য জেগে উঠল। একটা ছন্নছাড়া অপরিচ্ছন্ন শিশুমূর্তি হুমড়ি খেয়ে রয়েছে—তার মুখে-চোখে দুর্ভিক্ষ ও আতঙ্কের আভাস। তরফদার নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলেন, বৃদ্ধার মুখের উপর থেকে ধীরে ধীরে জরার চিহ্ন মুছে গিয়ে যৌবনের লালিত্য ফুটে উঠেছে। তারপর এগিয়ে এল সেই কালো ছায়া, তার নিরেট কালিমার মধ্যে সবকিছু অবলুপ্ত হয়ে গেল।

ঘরের ভেতর তখন শুধু ক্ষুদ্র লৌকিক জীব তরফদার আর সেই বিপুল অলৌকিক ছায়ামূর্তি। আবার দেখা দিল তার কেউটের মত দুটো উৎকট চক্ষু। আলো বুদ্বুদগুলো আবার অনিয়মিত, এলোমেলো গতিতে উঠছে, নামছে, ছুটোছুটি করছে, ঘরের ভেতর এসে পড়া চন্দ্রকিরণের সঙ্গে করছে মেলামেশা।···

ঘরের অন্ধকার সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, কালো ছায়াও হয়ে আসছে ক্ষীণ, ক্রমেই ক্ষীণ। ছায়া যত ক্ষীণতর হচ্ছে, টেবিলের উপরে বাতি দুটোর শিখা হয়ে উঠছে ততই উজ্জ্বলতর।···

ঘরের এক জায়গায় কুকুরটা স্থির হয়ে শুয়ে আছে। তরফদার তাকে ডাকলেন – সে জাগল না, নড়লও না। কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সে মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে। তার চোখ দুটো বেরিয়ে পড়ছে। জিভখানাও মুখের বাইরে ঝুলছে।

তরফদার প্রথমে ভেবেছিলেন দারুণ আতঙ্কেই সে মারা পড়েছে। পরে পরীক্ষা করে দেখলেন তা নয়। তার কণ্ঠদেশ ভেঙে গিয়েছে—মেরুদণ্ড থেকে মোচড় দিয়ে বার করে আনা হয়েছে। ভাবলেন, অন্ধকারের মধ্যেই কি হয়েছে এই কাণ্ড? এর জন্য দায়ী কি তারই মত কোন মানুষের অস্থি-মাংস-দিয়ে-গড়া হাত?

বড় পুরস্কার জিতে নিন

এক লক্ষ টাকা আপনার হতে পারে

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্কে অক্টোবর 6, 1975-এর আগে 200 টাকা বা তার বেশী দিয়ে একটি জমার খাতা খুলুন। পুরস্কারের জন্যে যত দিন আপনাকে প্রতীক্ষা করতে হবে, ততদিন আপনার খাতায় শতকরা 5 টাকা হারে করমুক্ত সুদ জমা পড়বে। আপনি ঐ খাতায় টাকা জমা দিতে বা তুলতেও পারেন, শুধু দেখতে হবে যে মার্চ 31, 1976 পর্যন্ত খাতায় বাকীর পরিমাণ যেন কখনও 200 টাকার কম না হয়। এই সর্ত মেনে চললে আপনি 1976-এ জুলাই মাসের 'ড্র'-এ সামিল হতে পারবেন। আপনি নিজের নামে, বিভিন্ন ডাকঘরে একাধিক খাতা খুলতে পারেন। তাছাড়া আপনার পরিবারের প্রত্যেকের নামে, এমন কি নাবালক/নাবালিকার নামেও অনুরূপভাবে একাধিক খাতা খুলতে পারেন।

মোট 20.50 লক্ষ টাকার
11,116 টি পুরস্কার।
বছরে দুটি ক'রে 'ড্র'।

পুরস্কার

	টাকা
একটি প্রথম পুরস্কার	1,00,000
পাঁচটি দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি	50,000
দশটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি	20,000
একশটি চতুর্থ পুরস্কার প্রত্যেকটি	5,000
এক হাজারটি পঞ্চম পুরস্কার প্রত্যেকটি	500
দশ হাজারটি ষষ্ঠ পুরস্কার প্রত্যেকটি	50

প্রণিধানযোগ্য

যদি আপনি 1976-এর জুলাই 'ড্র'-ঐ কোনও পুরস্কার না-ও পান, তবু মনে রাখবেন যদি আপনার ঐ জমার খাতায় বরাবরই অন্ততঃ 200 টাকা বা তার বেশী থাকে তাহলে ভবিষ্যতে সব ক'টি 'ড্র'-এ পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা থাকবে।

সম্ভব হ'লে আজই খাতা খুলুন

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

পোষ্ট বক্স নং 96, নাগপুর

dayp 76/176

আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার! তরফদার তার ঘড়িটাও আবার টেবিলের উপরেই ফিরিয়ে পেলেন। কিন্তু বন্ধ হয়ে গিয়েছে, চলছে না।

এই অবস্থার মধ্যেও তরফদার নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। সেখানেই সূর্যোদয় পর্যন্ত রইলেন। কিন্তু বাকী রাতটুকুর মধ্যে আর কোন ঘটনা ঘটে নি।···তবু আলোমাখা ভোরবেলাতেও বুকের মধ্যে অনুভব করলেন কেমন বিষম আতঙ্কের শিহরণ!···তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। আবার কালকের মত শুনতে পেলেন তার আগে আগে কার যেন পদশব্দ।

তারপর নীচে এসে যখন দরজা খুললেন তখন স্পষ্ট শুনতে পেলেন, তার পেছন থেকে নিম্নকণ্ঠে কে হেসে উঠল।

তরফদার ভেবেছিলেন বাড়িতে এসে নিবারণের দেখা পাবেন। কিন্তু সে আর ফিরে আসে নি।

কিছুক্ষণ পরই তরফদার রমেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। বললেন, "আমার কৌতূহল তৃপ্ত হয়েছে। কালকের রাত্রের কথা শুনতে চান?"

রমেনবাবু বললেন, "ও-রকম কথা অনেক শুনেছি, আর শোনবার আগ্রহ নেই। আমি শুধু জানতে চাই, আপনি এই ভূতুড়ে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন কি না?"

"আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আপনাকেও একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি 'হিপনোটিজম্' বা সম্মোহন বিদ্যার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"জানেন তো, সম্মোহিত ব্যক্তি সম্মোহনকারীর প্রভাবে পড়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই নানা কাজ করে। সম্মোহনকারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকলেও বিদ্যমান থাকে তার সম্মোহনের প্রভাব। সে দূর থেকেই যা দেখাতে চায়—তা যত উদ্ভট বা আশ্চর্যই হোক না কেন—সম্মোহিত ব্যক্তি দেখে সেই সব বস্তু বা দৃশ্য।"

"এই রকম সব কথা শুনেছি বটে। কিন্তু সম্মোহন বিদ্যার সঙ্গে বাড়ির ভৌতিক ঘটনাগুলোর সম্পর্ক কি?"

"বলছি। আপনি প্রেততত্ত্ববিদদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন?"

"না।"

"তাদের কার্যকলাপের কথা শুনেছেন?"

"শুনেছি।"

"তারা টেবিল চেয়ার সচল করেন, শরীরী প্রেতও নাকি দেখান। ভারতের এক শ্রেণীর যাদুকরের কীর্তি পৃথিবী-বিখ্যাত। তাদের খেলার নাম 'রোপ্ ট্রিক' বা 'দড়ির ফাঁকি'। যাদুকরের একগাছা মোটা দড়ি সোজা লাঠির মত শূন্যে বহু ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে স্থির হয়ে থাকে। তারপর একটা ছেলে সেই দড়ি অবলম্বন করে উপরে উঠে সকলের চোখের আড়ালে কোথায় মিলিয়ে যায়। তারপর নাকি শূন্য থেকে ঝুপ-ঝুপ করে নীচেয় এসে পড়ে ছেলেটার খণ্ড খণ্ড দেহ। যাদুকর আবার দেহের খণ্ড অংশগুলো জুড়ে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে তোলে।"

"আপনার বক্তব্য কি, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"রমেনবাবু, আমার মতে ঐ সব ব্যাপারের প্রত্যেকটির মধ্যে কাজ করে সম্মোহন। আমার সৃষ্ট মোহিনীশক্তির গণ্ডীর ভিতরে যে এসে পড়বে, তাকে আমি যা দেখাব, সে তাই দেখবে, আমি যা শোনাব, সে তাই শুনবে। তারা হবে আমার মস্তিষ্ক বা ইচ্ছাশক্তির দাস—আমার প্রভাবে সকল রকম অসম্ভবই তাদের কাছে হবে সম্ভবপর।"

"বেশ। আমি তর্ক করতে চাই না। তারপর আপনি কি বলতে চান?"

"রমেনবাবু, আমার বিশ্বাস আপনার ঐ বাড়ির ভিতরে ঐ রকমের কোন মস্তিষ্কের প্রবল ইচ্ছাশক্তি কাজ করে। সে কে বা তার কার্যপদ্ধতি কি আমি তা জানি না। হয়তো আজ সে জীবিত নেই, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব তবু লুপ্ত হয় নি।"

"আপনার কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছি।"

"আমি যে ঘরে ছিলুম, তার সঙ্গে সংলগ্ন একখানা ছোট ঘর আছে। খুব সম্ভব যত কিছু উপদ্রব আর অমঙ্গলের মূল আছে ঐ ঘরেই। যদি আমার কথা শোনেন, তবে ঐ ঘরটা ভেঙে ফেলুন।"

"বেশ, ভেঙে দেখবো।"

"ঐ বাড়ি যে বুড়ির জিম্মায় ছিল, বোধহয় তাকেই লেখা দু'খানা চিঠি আমি দেখেছি। অত্যন্ত সন্দেহজনক চিঠি। বুড়ীর ঘরের দেরাজেই চিঠি দু'খানা রেখে এসেছি। আপনিও পড়ে দেখতে পারেন। তারপর যদি ইচ্ছা করেন, বুড়ীর পূর্বজীবন সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর নেবেন।"

তরফদার গাত্রোত্থান করলেন। রমেনবাবু বললেন, "যথাসময়েই সব খবর পাবেন। নমস্কার।" (আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

রাণী না দেবী

গৌরী সাহারায়

রাণী ভবানীর দানশীলতার সীমা ছিল না। নিজের রাজ্যের প্রজাদের দুঃখমোচনের জন্য দান করতেন মুক্তহস্তে। যখন তিনি বিভিন্ন পুণ্যকর্মের জন্য কাশীতে গিয়ে বাস করতেন তখনও তাঁর জমিদারী হতে অসংখ্য নৌকায় করে অর্থ ও জিনিসপত্র কাশীতে আসত। একবার রাণীর প্রয়োজনীয় অর্থ এসে পৌছতে দেরী হল। এজন্য রাণী একটু বিপদে পড়লেন। তাকে যথারীতি দানকার্য করতে হবে, অথচ অর্থ এসে পৌছায় নি। তাই কাশীর ধনী বণিক অমৃতলালের নিকট রাণী এক লক্ষ টাকা ধার চেয়ে পাঠালেন।

অমৃতলাল টাকা দিলেন না। উপরন্তু বললেন—অমন রাজা রাণী আমি অনেক দেখেছি। বাংলাদেশের অনেকেই কাশীতে এসে জমিদার বা রাজা বলে নিজেদের পরিচয় দেয়; আসলে সবই ধাপ্পাবাজি। রাণীকে আমি চিনি না, কাজেই টাকা আমি তাকে দিতে পারবো না।

রাণী সব শুনলেন কিন্তু কিছু বললেন না।

ওদিকে সেই রাত্রেই বণিক অমৃতলাল অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, স্বয়ং দেবী অন্নপূর্ণা তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলছেন—ওরে মূর্খ, তুই একি করলি? তুই কাকে টাকা দিতে অস্বীকার করলি? জানিস না ও আর আমি এক। যা, এক্ষুণি তার পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নচেৎ তোর সর্বনাশ হবে।

অমৃতলাল স্বপ্নের কথা স্মরণ করে নিতান্ত বিস্মিত ও ভীত হলেন। পরদিন ভোর হতে না হতেই এক লক্ষ টাকা সঙ্গে নিয়ে রাণীর বাসভবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাণী তখন নিজের নিভৃতকক্ষে জপতপ ও পূজার্চনায় রত ছিলেন। কাজেই তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। অমৃতলাল রাণীর প্রধান কর্মচারীকে বললেন—আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। রাণী আমার নিকট এক লক্ষ টাকা কর্জ চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি দেই নি। পরে আমি বুঝতে পেরেছি যে তিনি কে। তাই তাঁকে দেবার জন্য আমি এই টাকা নিয়ে এসেছি। দয়া করে রাণীকে এই অর্থ গ্রহণ করতে বলুন আর একটিবার তাঁর চরণ দর্শন করতে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন।

এই বলে অমৃতলাল এক লক্ষ টাকা রাণীর প্রধান কর্মচারীর হাতে অর্পণ করল।

কিছুক্ষণ পর কর্মচারীর নিকট সমস্ত শুনে রাণী বলে পাঠালেন এখন আমার কারো সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। যখন আমি অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাবো, তখন সেখানে গেলে দেখা হতে পারে।

অপরাহ্ণে রাণী ভবানী অন্নপূর্ণার মন্দিরে দেবীদর্শনে গমন করলেন। সেই সময়ে অমৃতলালও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দূর থেকে দেখতে পেলেন রাণীকে। কি অপূর্ব মূর্তি! রাণী আর দেবী অন্নপূর্ণায় কোন প্রভেদ নেই।

দেবী অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করতেও অমৃতলাল ভুলে গেলেন।

এক দামাল ছেলের গল্প

রণজিৎ চক্রবর্তী

বাংলা মায়ের এক দামাল ছেলের গল্প তোমাদের বলছি—নাম তার ন্যাড়া। ছোটবেলায় পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, নৌকো বেয়ে, ডোঙা ঠেলে তার দিন কাটে। আজ থেকে তা' প্রায় অষ্টআশি বছর আগের কথা। তখন ইংরেজ রাজত্ব। বাবার সঙ্গে ন্যাড়া গেছে ভাগলপুরে। বাবা সরকারী কাজে সেখানে বদলি হয়ে গেছেন। ন্যাড়া তাই সেখানকার জেলা স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

দুরন্ত দামাল ন্যাড়া দুষ্টুমিতে শিরোমণি। কিন্তু ছোটবেলা থেকে সাহিত্য খুব ভালোবাসে। গল্পও লেখে। ভাগলপুর স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে একটা সাহিত্যসভাও পত্তন করেছিল সে। ন্যাড়া ছিল তার সভাপতি। সাহিত্যসভার একটা হাতে লেখা মুখপত্র ছিল। নাম তার 'ছায়া'। শনিবার স্কুলের ছুটির পরে বসতো সেই সাহিত্য-সভা। কবিতা পাঠ, গল্প, আলোচনা কত কি তার বিষয়সূচী।

এমনি এক শনিবার স্কুলের পিছনের বাগানে ন্যাড়াদের সাহিত্যসভা বসেছে। সন্ধ্যার কিছু পরেই হঠাৎ ন্যাড়াদের বাংলার মাস্টার মশাই সেখানে এসে হাজির। তাঁর মুখ-চোখের ভাব দেখেই কেমন যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল ছেলেরা।

মাস্টার মশায়ের হঠাৎ সেখানে আসা, মুখের ভাবভঙ্গি দেখে ছেলেরা স্পষ্টতই বুঝতে পারলো যে, একটা অঘটন কিছু ঘটেছে।

ছেলেদের ঔৎসুক্যে এবং আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে মাস্টার মশাই সকরুণ ব্যথায় খুলে ফেললেন তাঁর গায়ের জামাটি। দলপতি ন্যাড়া ও তার সঙ্গীরা সবিস্ময়ে দেখলো যে, তাঁর সারা পিঠ রক্তাক্ত। চাবুকের বাড়িতে ক্ষতবিক্ষত।

সেই সময় ভাগলপুরে একজন ইংরেজ সাব-ডিভিসনাল্ অফিসার ছিল, ভারী বদমেজাজী আর খামখেয়ালী।

প্রত্যেক শনিবার ক্লাবে যেত সে, আর ফিরতো মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে। সেই মাতাল অবস্থায় গাড়ী (ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়ী) চালাতো সে নিজে। আর

সহিসটা পিছনে থাকতো দাঁড়িয়ে। রাস্তা দিয়ে তখন যে লোকই যেতো, তারই পিঠে পড়তো সাহেবের চাবুক। ভাগলপুরে অনেকেই তার চাবুকের মার খেয়েছে। মাস্টার মশায়ের ব্যাপারটা খেয়াল ছিল না। তিনি কি একটা কাজে সেদিন ঐ রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলেন আর হঠাৎ পড়েও গেলেন সাহেবের সামনে। ব্যস, আর যায় কোথায়, সাদা চামড়ার সাহেবের রক্ত মাথায় উঠে গেল। মাস্টার মশায়ের পিঠেও পড়লো সপাং সপাং চাবুক।

দলপতি ন্যাড়া আর তার সঙ্গীরা সব দেখে শুনে শপথ করলো, এর প্রতিকার তারা করবে। ন্যাড়ারও যে কথা সেই কাজ।

ন্যাড়াদের দলে একটি ছেলে ছিল, সে ভালো খাপ্‌লা জাল (যা দিয়ে মাছ ধরে) ফেলতে পারতো। ঠিক হলো, সে ন্যাড়ার পাশে থেকে দড়ির ফাঁস তৈরী করে ঘোড়ার গলায় পরিয়ে দেবে। তারপর টান দিলেই ঘোড়া যাবে উল্টে আর সাহেবও পড়বে মাটিতে। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চট্‌পট্ ধোলাই সেরে যাবে তারা পালিয়ে।

পরিকল্পনা মতো একদিন কিছু ছেলে তৈরী হয়ে নিলো। রাস্তার দু'ধারে ছিল বড় বড় গাছের সারি। গাছের পাশে ছেলেরা ছড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিটন গাড়ীও এসে গেল ন্যাড়াদের সামনে। তখনি দলপতির ইঙ্গিতে সঙ্গী বন্ধুও ছুঁড়ে দিলো দড়িটা। দড়ির টানে ঘোড়াও চিঁইই শব্দ করে লাফিয়ে উঠে একেবারে পড়ে গেল মাটিতে। সেই সঙ্গে সাহেবও কুপোকাৎ। ন্যাড়ার বাঁশির সংকেতে মুহূর্তেই একদল ছেলে ছুটে এসে ধোলাই শুরু করে দিলো সাহেবকে।

সেই দৃশ্য দেখে গাড়ীর সহিসও ততক্ষণে গেছে পালিয়ে। ন্যাড়া আবার তখন কি করলো জানো?

মাস্টার মশাইকে মারার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য মাটি থেকে তাড়াতাড়ি তুলে নিলো সাহেবের টুপিটা। তখনি তার ভিতর মূত্র ত্যাগ করে টুপিটা পরিয়ে দিলো সাহেবের মাথায়।

সাহেব ততক্ষণে তারস্বরে কাঁদছে। এবার সোচ্চারে বলে উঠলো :

': মাই ফাদার—সেভ্ মি।

তখন কোথায় বা সাহেবের ফাদার আর সাহেবকে তখন সেভ্ই বা করছে কে ?

নির্জন রাস্তা, জনপ্রাণী কেউ কোথাও নেই। আর দেরি না, মুহূর্তেই আবার ন্যাড়ার নির্দেশে ছেলের দল অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে লোকজন ডেকে নিয়ে এসে সহিস সাহেবকে তুলে বাড়ী নিয়ে যায়।

সাহেবের ক্লাবে যাওয়া তারপর থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

শুধু ক্লাবেই নয়, কিছুদিন পরে ভাগলপুর ছেড়েই চলে গিয়েছিল সাহেব।

প্রতিশোধের ব্যাপারটা গোপনেই সমাধা হয়ে গেল। মাস্টার মশাই শুধু জানতেন। তিনি শুধু জানতেনই না, বদমায়েস সাহেবকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য ন্যাড়া আর তার অপরাপর সঙ্গীদের প্রাণভরে আশীর্বাদও করেছিলেন।

শহরে পরে অবশ্যি হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিলো, কিন্তু প্রমাণ অভাবে কেউই ধরা পড়ে নি।

এই দুঃসাহসী দামাল্ ন্যাড়াকে চিনতে পেরেছো ?

তিনি বাংলা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন।

এই ন্যাড়াই হচ্ছেন—দরদী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ১২৮৩ সনের ৩১শে ভাদ্র (ইং ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) বুধবার হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। শরৎচন্দ্রের পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী।

শরৎচন্দ্র কিন্তু দুরন্ত হলেও ছিলেন মেধাবী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধর, তাঁর বয়স যখন পাঁচ, তখনি গ্রামের প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হন। বছর তিনেক সেই পাঠশালায় পড়ে দেবানন্দপুরে সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের স্কুলে ভর্তি হন। সেখানেও প্রায় বছর তিনেক পড়ে চলে যান বিহারের ভাগলপুরে। শরৎচন্দ্র সেখানে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীতে ভর্তি হন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভাগলপুর জেলা স্কুলে ভর্তি হন সেভেনথ্ ক্লাসে অর্থাৎ এখনকার ক্লাস ফোর-এ। স্কুলে ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয়ে

কৃতিত্বের জন্য শরৎচন্দ্র একেবারে ডবল প্রমোশান পেয়ে উঠে পড়েন ফিফথ্ ক্লাসে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর আবার তাঁকে ফিরে আসতে হয় দেবানন্দপুরে।

হুগলীর ব্রাঞ্চ স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা করে তিনি ফিরে যান ভাগলপুরে এবং জেলা স্কুলে আবার ভর্তি হন।

দশম শ্রেণীতে উঠে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পড়া তাঁর বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলের মাহিনা দিতে পারেন না।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ভাগলপুরে থাকতেন। তিনি তখন তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। তিনি শরৎচন্দ্রের পড়াশুনায় আগ্রহ এবং সাহিত্যপ্রীতি দেখে অনেক চেষ্টা করে প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র বসুর সাহায্যে তাঁরই স্কুলে ভর্তি করে নিলেন।

তেজনারায়ণ স্কুল থেকেই ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃতিত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শরৎচন্দ্র এফ.এ. (বর্তমানের আই.এ.) পড়বার জন্য ভর্তি হলেন টি. এন. জুবিলী কলেজে।

কিন্তু সে বছরই মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে এবং আর্থিক অভাবের কারণে পড়া তাঁর বন্ধই হয়ে গেল।

মতিলালের সাংসারিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। ভাগলপুরের খঞ্জরপুর এলাকায় তিন ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে কায়ক্লেশে তিনি দিন কাটাতেন। শরৎচন্দ্রই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। অর্থনৈতিক কৃচ্ছসাধনের কারণে শরৎচন্দ্র সংসারের ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন, তাই বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা, এবং নাটক অভিনয়ে তাঁর সময় কাটতো।

শরৎচন্দ্রের সহপাঠী অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনিই শ্রীকান্ত উপন্যাসের 'ইন্দ্রনাথ'। মাঝে মাঝে কাউকে কিছু না বলে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন শরৎচন্দ্র।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর জীবিকার তাগিদে শরৎচন্দ্র চলে যান ব্রহ্মদেশে। সেখানে প্রায় তের বছর ছিলেন। ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুন শহরে একাউনটেন্ট জেনারেল অফিসে কেরানীর চাকরি করতেন শরৎচন্দ্র। সেই সময় থেকেই সার্থক সাহিত্যিকরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটে।

শরৎচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় সতেরো বছর বয়সেই 'রামের সুমতি' রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'বড়দিদি'। শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গল্পটির নাম 'মন্দির'। গল্পটি স্বনামে না লিখে মাতুলের (সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) নামে তিনি লিখেছিলেন। 'মন্দির' কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করায় শরৎচন্দ্র পঁচিশ টাকা পারিতোষিক লাভ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের রচনা আজো জনপ্রিয়। অনেক গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক তিনি রচনা করেছেন—বড় হয়ে তোমরা সেগুলো পড়বে নিশ্চয়ই।

শরৎচন্দ্র জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে যা উপলব্ধি করেছিলেন, তাই সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। সমাজের অন্যায় অবিচার যেমন সাহিত্যে তুলে ধরেছেন, তেমনি অবহেলিত নিপীড়িত মানুষের উদারতা, নিগৃহীতা নারীর মর্মব্যথাও অকপটে প্রকাশ করেছেন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে। তাই শরৎচন্দ্র দরদী কথাশিল্পীরূপে সকলের মন জয় নিয়েছিলেন, হয়েছিলেন অপরাজেয় সাহিত্যিক। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল তাই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

———

শরৎ সকালে

পিনাকীরঞ্জন কর্মকার

"নীলচে-নীল আকাশটা তো শিশুর মত !
হাসিতে তার মিষ্টি ঝরে মধুর কত।
টই-টুম্বুর জল জমেছে শুক্‌নো দীঘি ঝিলে,
সোনা-সোনা রোদ্দুরেতে সব গেছে যে মিলে।
পেরজাপতি পাখ্‌না মেলে ওড়ে খুশীর গানে,
শরৎ দিনের হাওয়ায় হাওয়ায় শিউলি আমেজ আনে ॥

—০—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উকাবো পালিয়ে যাবার জন্য ছুটতেই হেনরী দ্রুতবেগে দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেললো।

উকাবোর সঙ্গে হেনরীর শুরু হল ধস্তাধস্তি।

ওদিকে টারজান মাটির ওপর পড়ে আছে। তার জ্ঞান নেই। জর্জ ভাবলো, নিশ্চয়ই মরে গেছে টারজান। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য নাকের কাছে হাত রেখে দেখলো নিশ্বাস প্রশ্বাস বের হচ্ছে কিনা।

দেখলো, ধীরে ধীরে যেন শ্বাস প্রশ্বাস বইছে।

এবার দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল জর্জের মাথায়। সেই বড় পাথরটা তখনও টারজানের মাথার কাছেই ছিল। সেটা তুলে নিয়ে টারজানের মাথাটা গুঁড়ো করে দেবার জন্যে সে প্রস্তুত হলো।

পাথরটা তুলতে যাবে এমন সময় সেদিকে ছুটে এলো সর্দার ও তার দলের লোকেরা। সর্দারের অনুচরদের একজন তীক্ষ্ণ এক বর্শা ছুড়ে মারলো জর্জকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্য ব্যর্থ হলো, বর্শা জর্জের পিঠে বিদ্ধ না হয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল অন্যদিকে। অল্পের জন্য টারজান রেহাই পেল। নইলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেটা টারজানের গায়ে গিয়েই বিঁধতো।

জর্জের এক অনুচর প্রভুকে বাঁচাবার জন্য ছুটে এলো। যে লোকটি জর্জের দিকে বর্শা ছুড়ে মেরেছিল তার দিকে সেও ছুড়ে মারলো একটি বর্শা। তার লক্ষ্য কিন্তু ভ্রষ্ট হলো না। সেই বর্শার আঘাতে সর্দারের অনুচর ভূতলশায়ী হলো।

সর্দারের দৃষ্টি তখন টারজানের দিকে। আর দেরী করলে টারজানকে হয়তো বাঁচানো যাবে না। ওদিকে একটু থমকে গিয়ে আবার নিজেকে সামলে নিয়েছে জর্জ। সে পাথরটা উঠিয়ে টারজানকে আবার মাথায় আঘাত করবার জন্যে উদ্যত হয়েছে।

পেছন থেকে সর্দার চীৎকার করে বললো—হুঁশিয়ার।

জর্জের হাতটা কেঁপে উঠলো।

সর্দারের হাতের বর্শাটা এবার এসে লাগলো জর্জের পিঠে। জর্জ কাতর আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল।

যুদ্ধ তখন শেষ।

জর্জের সঙ্গে যারা এসেছিল তারা পালিয়ে গেছে প্রাণের ভয়ে। কাউকে আর কাছাকাছি দেখা গেল না।

ওদিকে হেনরী সর্দারের লোকজনদের সাহায্যে উকাবোকে ধরে ফেলেছে।

এদিকে আহত অবস্থায় পড়ে আছে জর্জ।

কিন্তু সবচেয়ে চিন্তার কথা হলো টারজানও অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছে।

উকাবোকে সর্দারের লোকদের হাতে দিয়ে হেনরী তাড়াতাড়ি টারজানের কাছে ছুটে এল। আশ্চর্য শক্তিধর টারজান। হেনরী কাছে যেতে দেখেই সে চোখ মেলে তাকালো, তারপর উঠে বসলো।

টারজান বললো—আমার জন্য কোন চিন্তা করো না হেনরী। ওদিকের খবর কি?

হেনরী বললো—ওদিকের খবর সব ভালো।

এমন সময় টারজনের চোখ পড়লো জর্জের দিকে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে জর্জ। তা দেখে টারজান বললো—লোকটা কি বেঁচে আছে? ওকে একটু দেখো হেনরী, ওর কাছ থেকে হয়তো কোন গুপ্ত সংবাদ পাওয়া যেতে পারে।

হেনরী বললো—হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছ। লোকটা কেন আমাকে ধরতে চেয়েছিল তা জানা দরকার।

হেনরী ও টারজান জর্জের কাছে এগিয়ে গেল। বর্শাটা হেনরী জর্জের পিঠ থেকে খুলে ফেললো অতি সন্তর্পণে। বললো—লোকটা ভয়ানক ভাবে আহত হয়েছে টারজান। বাঁচানো মুস্কিল। তবে এখনো জ্ঞান আছে।

জর্জ কাতর কণ্ঠে বললো—আমি জানি আমি মরতে চলেছি। বাঁচার কোন সম্ভাবনা আমার নেই। তবু আমি বলে যেতে চাই কেন আমি তোমার মৃত্যু চেয়েছিলাম। তুমি আমার কাছে ছিলে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি।

হেনরী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো—কেন তুমি আমার মৃত্যু চেয়েছিলে?

জর্জ তার প্যাণ্টের পকেট থেকে বের করলো ভাঁজ-করা একটি পুরনো খবরের কাগজ—ডেইলী মর্নিং নিউজ। সেটা হেনরীর হাতে দিল।

হেনরী ভাঁজ খুলে পড়লো—প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—জনসনের হত্যার দায় হতে ডাক্তার হেনরী মুক্ত। আসল আসামী ধৃত। তারপর নীচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা—আসামী ধরা পড়ে তার অপরাধ স্বীকার করেছে।

সেই সংবাদ পড়ে হেনরী স্তব্ধ হয়ে রইলো। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলো না।

জর্জ মৃদুকণ্ঠে বললো—হেনরী, তুমি খুব তাড়াতাড়ি দিশেহারা হয়ে পালিয়ে এসেছ। তা না হলে আসামী ধরা পড়ার খবর তুমি জানতে পারতে। আরও জানতে পারতে এক লক্ষ পাউণ্ড জনসন তোমার জন্য উইল করে রেখে গিয়েছেন।

—আমার জন্য! বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো হেনরী।—আমার জন্য জনসন টাকা রেখে যাবে কেন?

জর্জ বললো—হ্যাঁ। জনসন তোমাকে খুব ভালোবাসতেন! সেই ভালোবাসার পুরস্কার দিয়ে গেছেন।

হেনরী জিজ্ঞেস করলো—কিন্তু তোমার এই ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন? কেন তুমি আমার খোঁজ করছিলে? আমাকে মারবার জন্য চেষ্টা করছিলে কেন?

জর্জ বললো—কারণ আমি নিঃসন্তান জনসনের ভাগ্নে। তোমার পরে আমারই তার সম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ অধিকার।

একটু থামলো জর্জ। ভালভাবে কথা বলতে পারছিল না। কিছুক্ষণ পর বললো—আমার ধনী হবার খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হলো না।

ক্রমশঃ যেন ব্যথায় কুঁকড়ে উঠতে লাগলো জর্জ। কথা বলতে ভয়ানক কষ্ট হতে লাগলো তার। তারপর একসময়ে তার মুখের ভাষা স্তব্ধ হয়ে গেলো। চোখের দৃষ্টিও গেল স্থির হয়ে।

হেনরী কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে বললো—জর্জ আর বেঁচে নেই।

টারজান বললো—ওর মৃতদেহের যথারীতি সৎকার করা দরকার হেনরী। তোমার শত্রু হলেও শেষ পর্যন্ত তোমার উপকারই সে করে গেল।

হেনরী বললো—হ্যাঁ, তা সত্যি। আমাদের রীতি অনুযায়ীই ওর সৎকার করবো। চলো তো দেখি, ওর সঙ্গের লোকজনেরা কোথায় গেল?

সর্দার বললো—ওর দলের দুটো লোক তো মারা গেছে। বাকী লোকেরা কোথায় গেল কে জানে?

হেনরী বললো—ওদের খুঁজে বের করা দরকার।

সর্দার তখনই তার লোকদের বললো—তোমরা যাও, এদিক ওদিক সবদিক খুঁজে এই লোকটার সঙ্গীদের বের করো।

সর্দারের লোকেরা বেরিয়ে গেল।

টারজান হেনরীর পিঠ চাপড়িয়ে বললো—ডাক্তার তুমি এখন শত্রুর হাত থেকে মুক্ত। শুধু তাই নয় তুমি এখন বিরাট ধনীলোক।

সর্দার বললো—আমিও তোমার সৌভাগ্যে খুব আনন্দিত হয়েছি ডাক্তার। কিন্তু আমার ছেলের জন্য আমি বড় চিন্তিত। শয়তান ডাইনী বৈদ্যটার সঙ্গে এবার আমি কথা বলতে চাই।

উকাবোকে সর্দারের সামনে নিয়ে আসা হলো। সর্দার তাকে জিজ্ঞেস করলো—শয়তান, বল্ আমার ছেলে কোথায়?

উকাবো বললো—আমি জানি না।

ধমক দিয়ে বললো সর্দার—মিথ্যেবাদী তুই জানিস না তবে কে জানে?

উকাবো দাঁতে দাঁত রেখে বললো—জানি না।

সর্দার প্রচণ্ড এক লাথি মারলো ডাইনী উকাবোর পেটে। হাত বাঁধা অবস্থাতেই উকাবো মাটিতে পড়ে গেল।

(আগামী বারে শেষ হবে)

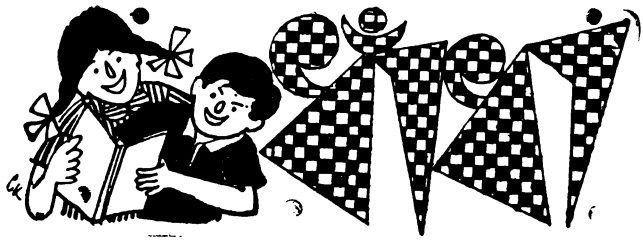

প্রতি মাসে আসে বটে, থাকতে চায় না,
পক্ষ আছে তবু কিন্তু উড়ে যায় না।
একটির ডানা কালো, অপরটির সাদা,
বলো দেখি এটা কোন্ ধাঁধা ?

—শ্রীবিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদ্র মাসের ধাঁধার উত্তর : তাল

নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম : হাপি, কিঙ্কর, ভাস্কর, শশাঙ্ক, ১১সি নিমতলা লেন, কলিকাতা। আবদুল অহাব, পাহাড়পুর, মুর্শিদাবাদ।

ধাঁধার মতোই, ধাঁধা নয়

১। সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণী কি ?
২। সবচেয়ে ছোট পাখী কি ?
৩। এক চামচ স্যাকারিন কত চামচ চিনির সমান মিষ্ট ?
৪। কোন্ দেশে রেললাইন নাই ?
৫ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শীতল স্থান কোন্‌টি ?

সংগ্রাহক : অনির্বাণ পাল

১। কচ্ছপ (৩০০ বছর) ২। হামিং বার্ড ৩। ৩৫০ চামচ
৪। আইসল্যাণ্ড ৫। ভার্খয়ানস্ক (রাশিয়া)।

KALARAB REGD. NO. WB CC 237
THIRD YEAR ELEVENTH ISSUE——ASHWIN 1382 B.S.